বিশ্ব দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীন দিবস

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৫ ❖ ২৩ - ২৯ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

পরিবারে প্রবীণা নারীর বাস্তবতা

দাদা-ঠাকুরমা, নানা-নানী : পরিবারে ঈশ্বরের আশীর্বাদ

অন্তাচল

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি প্রতিষ্ঠান। প্রথমদিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশ্যেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর মান উন্নয়ন, মাণ্ডলীক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক ও মানসিক গঠনের লক্ষ্যে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী (প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, কলাম, ছোটদের আসর, সাহিত্য মজুরী, খোলা জানালা, সংবাদ ও পত্রবিতান) লেখা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।

৩. লেখা অবশ্যই কম্পোজ করে, SutonnyMJ এবং ফন্টে windows 7-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

৪. লেখা মানসম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়। মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তাছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।

৫. স্থানীয় সংবাদগুলো ভাল রেজ্যুলেশনপূর্ণ ছবিসহ পাঠানোর আবেদন রাখছি। স্থানীয় সংবাদগুলো অবশ্যই তথ্যপূর্ণ (বিষয়বস্তু, কারা জড়িত, কোথায় ঘটেছে, মূল বক্তব্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদি) ও সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ, ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ২৫
২৩ - ২৯ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
৮ - ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

বোঝা নয় বটবৃক্ষ

সামাজিক জীব মানুষের সম্পর্ক বহুধারায় বহমান। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের জীবনই বিভিন্ন রস, রং ও রসায়নে চলতে থাকে। বয়সের অনেক তারতম্য থাকলেও একটি পরিবারে শিশু ও বৃদ্ধরা সহজেই পারস্পরিক মিতালি গড়ে তুলে এবং একজন আরেকজনের প্রিয়জন হয়ে ওঠে। ফলে পরিবারে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে সকলেই আনন্দে থাকে। পরিবারে বৃদ্ধদের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব দিতে এবং বৃদ্ধ দাদা-ঠাকুরমা, নানা-নানীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকে আরেকটু বেশি সংবেদনশীল হতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ৩ বছর আগে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্ব দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস। যা প্রতিবছর জুলাই মাসের শেষ রবিবারে পালন করা হয়। ২৬ জুলাই যিশুর নানা-নানী সাধু যোয়াকীম ও সাধ্বী আন্নার পর্ব দিবসের কথা বিবেচনায় এনে এই দিনটি নির্ধারণ করা হয়। পোপ মহোদয়ের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীও এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় ধর্মপ্রদেশে ও ধর্মপল্লীতে পালন করার আহ্বান রাখেন। পরিবারগুলোকে বিশেষভাবে বলা হয় তাদের পরিবারে যেন কথায় ও কাজে বৃদ্ধদের যত্নদান, সম্মান ও শ্রদ্ধা যথার্থভাবে প্রকাশ পায়।

পরিবারে বয়োজেষ্ঠ তথা দাদা-ঠাকুরমা, নানা-নানী তারা আমাদের জন্য ঈশ্বরের এক বড় আশীর্বাদ। পারিবারিক জীবনে তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, বটবৃক্ষের ন্যায় পরিবারকে ছায়া দেয়, ভালোবাসা ও সহযোগিতার বন্ধনে পরিবারকে আঁকড়ে রাখেন আর পারিবারিক সম্পর্ককে গভীর করে তোলে। দাদা-ঠাকুরমা, নানা-নানীরা পারিবারিক শিক্ষা ও ঐতিহ্য লালন-পালন করে তা প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধ করেন এবং এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের কাছে তা হস্তান্তর করেন। তারা হলেন আমাদের পথ প্রদর্শক। ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক মূল্যবোধ তারা শিক্ষা দেন। বিশেষ করে শিশু ও ছোটরা তাদের কাছ থেকে পায় ভালোবাসা ও আদর। আর আদরের আদলে সংশোধন ও জীবন বদলে দিতে দারুণ পারঙ্গম এই দাদু-দীদারা। কেননা জীবন গড়ে তোলার জন্য তাদের জীবন অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বের করে আনেন সঠিক দিক নির্দেশনা। তাই একটি পরিবারে তারা হয়ে ওঠেন একজন আদর্শ শিক্ষক, অভিভাবক, পরামর্শদাতা, নির্দেশক ও সংস্কারক। এই প্রবীণ মানুষগুলো সারা জীবন তাদের আপনজনদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান এবং জীবনের শেষ বেলায় প্রিয়জনদের সান্নিধ্যে আনন্দে থাকতে চান।

প্রবীণত্ব বা বার্ধক্য প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। মানুষের জীবনে বার্ধক্যের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম কখনো কখনো মানুষের জীবনে বয়ে আনে অনেক দুঃখ-কষ্ট। সময় ও শারীরিক অবস্থার পাশাপাশি প্রবীণদের মানসিক পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। এ সময় তাদের নিঃসঙ্গতা বেড়ে যায়। তাই এ সময়ে তাদের আশপাশের মানুষের উচিত পাশে থাকা, সাহায্যের হাত বাড়ানো। কিন্তু বর্তমানে বাস্তবতা হচ্ছে অধিকাংশ প্রবীণ ব্যক্তিই অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং বৈষম্যের শিকার।

বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রবীণ সেবার পরিধি অত্যন্ত সীমিত, বেসরকারি প্রবীণ নিবাসগুলোর অধিকাংশের অবস্থা শোচনীয়। বাংলাদেশের অনেক প্রবীণ ব্যক্তি নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের দ্বারাই প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। পিতা-মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের জোর করে বৃদ্ধাশ্রম বা অন্য কোথাও পাঠানো যাবে না মর্মে আইনের বিধানটিও লঙ্ঘিত হচ্ছে । জীবিকা নির্বাহের জন্য এখনো অনেক প্রবীণকে কোনো না কোনো ধরনের কায়িক পরিশ্রম করতে হয় এবং অনেক প্রবীণকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যেতে হয়।

সামাজিক সম্মানবোধ ও মানসিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে করুণা নয়, বরং শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা আর সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমেই সব সন্তান তথা দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রবীণদের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে হবে। অধিকারের প্রশ্নে নয়, বরং তাদের জীবনের শেষভাগ যেন সফল, সার্থক, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আপনজনের সান্নিধ্যে কাটে, তা নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হতে হবে। সম্প্রতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একটি চমৎকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনে অভিভাবকহীন শিশু এবং বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসকারী প্রবীণদের একই কমপাউণ্ডে থাকার ব্যবস্থা করেছে। এর ফলে শিশুরা বয়স্কদের আদর-স্নেহ পাবে। তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবে। পাশাপাশি প্রবীণদেরও সময়টা ভালো কাটবে। তারা ওই শিশুদের মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন। আমাদের এরকম আরও অনেক উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রবীণদের সমাজের বোঝা মনে করার মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে তরুণ জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ। আগামীতে তারা যখন বৃদ্ধ হবেন তখন দেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তাই নিজেদেরকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে যেন এই প্রজন্ম তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোকে যথার্থ সম্মান দেখিয়ে নিজেদেরকে সম্মানের স্থানে রাখতে পারে এবং যখন প্রবীণ হবে তখন যেন সত্যিই নবীনদের বটবৃক্ষ হয়েই থাকতে পারে। †

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

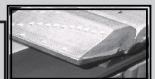

মানবপুত্র নিজ দূতদের প্রেরন করবেন, যা যা স্খলন ঘটায় তাঁরা সেইসব কিছু ও যত জঘন্য কর্মের সাধককে তার রাজ্য থেকে সংগ্রহ করবেন ও সেই অগ্নিকুন্ডে ফেলে দেবেন যেখানে হবে কান্না ও দাত ঘষাঁঘষি। -মথি ১৩:৪১,৪২

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

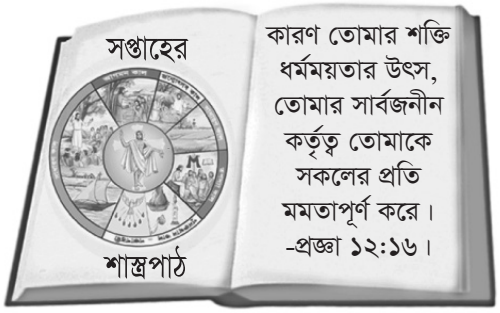

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৩-২৯ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

২৩ জুলাই, রবিবার

প্রজ্ঞা ১২: ১৩, ১৬-১৯, সাম ৮৫: ৫-৬, ৯-১০, ১৫-১৬ক, রোমীয় ৮: ২৬-২৭, মথি ১৩: ২৪-৪৩ (অথবা ১৩: ২৪-৩০) সুইডেনের সাধ্বী ব্রিজিতা, কুমারী

২৪ জুলাই, সোমবার

যাত্রা ১৪: ৫-১৮, সাম যাত্রা ১৫: ১-৬, মথি ১২: ৩৮-৪২
+ ২০১৫ ফা. বকুল এস. রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)

২৫ জুলাই, মঙ্গলবার

সাধু যাকোব, প্রেরিতদূত, *পর্ব*
২ করি ৪: ৭-১৫, সাম ১২৬: ১-৬, মথি ২০: ২০-২৮

২৬ জুলাই, বুধবার

ধন্যা কুমারী মারীয়ার পিতা-মাতা সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্না, *স্মরণ দিবস*
যাত্রা ১৬: ১-৫, ৯-১৫, সাম ৭৮: ১৮-১৯, ২৩-২৮, মথি ১৩: ১-৯

২৭ জুলাই, বৃহস্পতিবার

যাত্রা ১৯: ১-২, ৯-১১, ১৬-২০, সাম দানি ৩: ৫২-৫৬, মথি ১৩: ১০-১৭

২৮ জুলাই, শুক্রবার

যাত্রা ২০: ১-১৭, সাম ১৯: ৭-১০, মথি ১৩: ১৮-২৩

২৯ জুলাই, শনিবার

সাধ্বী মার্থা, সাধ্বী মারীয়া ও সাধু লাজার, *স্মরণ দিবস*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
১ যো ৪: ৭-১৬ (বিকল্প হিব্রু ১৩: ১-৩, ১৪-১৬), সাম ৩৪: ১-১০, যোহন ১১: ১৯-২৭ (বিকল্প লুক ১০: ৩৮-৪২)

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৩ জুলাই, রবিবার

+ ২০২০ সিস্টার জ্যোৎস্না আল্পনা আরএনডিএম (ঢাকা)

২৪ জুলাই, সোমবার

+ ২০১৫ ফাদার বকুল এস. রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)

২৫ জুলাই, মঙ্গলবার

+ ১৯৫৪ ফাদার থোমাসো কাত্তানেও (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৪ ফাদার জন কেইন সিএসসি (ঢাকা)

২৬ জুলাই, বুধবার

+ ১৯৬৩ ব্রাদার গডফ্রে ডেনিস সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৭ জুলাই,বৃহস্পতিবার

+ ১৯৫৬ সিস্টার মেরী বার্টিল আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৯ সিস্টার ডেজমন্ড ও'হারা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সিস্টার যোসেফ মেরী সিএসসি (ঢাকা)

২৮ জুলাই, শুক্রবার

+ ১৯৭৬ সিস্টার ইগ্নাৎসিয়া ওএসএল (খুলনা)

২৯ জুলাই, শনিবার

+ ১৯৭০ সিস্টার মেরী টেরেন্স আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৪ ফাদার আঞ্জেলো কান্তন পিমে (রাজশাহী)

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কারের তিনটি পদবিন্যাস

১৫৫৪: "খ্রীষ্ট-প্রতিষ্ঠিত মাণ্ডলিক সেবাকর্ম বিভিন্ন শ্রেণী অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে তাদের দ্বারা যারা খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রাচীন যুগ থেকে বিশপ, যাজক ও ডিকন রূপে অভিহিত হয়ে আসছেন"। উপাসনা-অনুষ্ঠানে প্রকাশিত কাথলিক ধর্মতত্ত্ব, খ্রীষ্টমণ্ডলীর শিক্ষাদানকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রচলিত রীতি স্বীকার করে যে, খ্রীষ্টের যাজকত্বে সেবাকারীর অংশগ্রহণ দু'টো শ্রেণীতে হয়ে থাকে: বিশপ- পদ ও যাজক-পদ। ডিকন-পদ বিশপ ও যাজককে সাহায্য ও সেবা করার উদ্দেশে নিয়োজিত। এই কারণে যাজক (sacerdos) শব্দটি, প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী, বিশপ ও যাজকদেরই বুঝায়, ডিকনদের নয়। তথাপি কাথলিক ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেয় যে, যাজকীয় অংশগ্রহণের পদবিন্যাস (বিশপপদ ও যাজকপদ) এবং সেবার পদবিন্যাস (ডিকনপদ)-এই তিনটিই একটি সংস্কারীয় ক্রিয়া, যা 'অভিষেক-অনুষ্ঠান' নামে অভিহিত, অর্থাৎ পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কার দ্বারা সম্পাদিত হয় ।

ডিকনদেরকে যীশু খ্রীষ্টের মত, বিশপদেরকে পিতার প্রতিমূর্তিরুপে এবং যাজকদেরকে ঈশ্বরের পরিষদ-সভা ও প্রেরিতদূতদের সম্মিলনীরূপে প্রত্যেকে শ্রদ্ধা করুক। কারণ তাদেরকে ছাড়া কেউ খ্রীষ্টমণ্ডলীর কথা বলতে পারে না।

বিশপ-পদে অভিষেক -পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কারের পূর্ণতা

১৫৫৫: "খ্রীষ্টমণ্ডলীর সূচনাকাল থেকে যে সমস্ত দায়িত্বভার মণ্ডলীতে প্রচলিত ছিল তার মধ্যে বিশপের দায়িত্বই প্রধান। পরম্পরাগত ঐতিহ্যই এর সাক্ষ্য। বিশপের মর্যাদা ও দায়িত্বে নিয়োজিত যারা, তারা প্রথম থেকে অবিচ্ছিন্ন উত্তরাধিকারসূত্রে এবং সেই গুণের ফলে, প্রৈরিতিক যোগসূত্রের কারণরূপে বিবেচিত "।

১৫৫৬: এই মহৎ মিশনদায়িত্ব পূর্ণ করতে "প্রেরিতদূতগণ খ্রীষ্টের দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন পবিত্র আত্মার এক বিশেষ অভিবর্ষণে, এবং হস্ত-স্থাপনের দ্বারা প্রেরিতদূতগণ তাদের সহকারীদের নিকট পবিত্র আত্মাকে প্রদান করেছিলেন, যা অদ্যাবধি বিশপ-অভিষেকের মাধ্যমে একইভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে"।

১৫৫৭: দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা "শিক্ষা দিচ্ছে যে, অভিষেকের দ্বারা বিশপগণ পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কারের পূর্ণতা লাভ করে থাকেন । এই পূর্ণতা খ্রীষ্টমণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক উপাসনা ঐতিহ্যে এবং মণ্ডলীর পিতৃগণের কথা অনুযায়ী 'মহাযাজকত্বের' পুণ্য সেবাকর্মের চূড়ামণি (summa) বলে আখ্যায়িত ।"

১৫৫৮: "বিশপ-পদে অভিষেক পবিত্রীকরণের দায়িত্বসহ শিক্ষাদান ও প্রশাসনের দায়িত্ব প্রদান করে...। বস্তুত.... অভিষেক-প্রার্থনা ও হস্ত-স্থাপনের দ্বারা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ প্রদান করা হয়। অভিষেকের ফলে এমন একটি অক্ষয় ছাপে তারা মুদ্রাঙ্কিত হন যে, বিশপগণ মহৎ ও দৃশ্য আকারে স্বয়ং খ্রীষ্টের ন্যায় শিক্ষক, পালক ও যাজক হয়ে ওঠেন, এবং তারা খ্রীষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন (in Euus persona agant)।" "সুতরাং যে পবিত্র আত্মাকে বিশপদের দেয়া হয়েছে। তাঁরই বলে বিশপদের গড়ে তোলা হয়েছে ধর্মবিশ্বাসের সত্য ও খাঁটি শিক্ষকরূপে এবং তাদের করা হয়েছে যাজক-প্রধান ও পালক"।

১৫৫৯: "সংস্কারীয় অভিষেকের গুণে এবং ভ্রাতৃসংঘের প্রধান ও অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে যাজক- শ্রেণীবিন্যাসগত মিলন-সংযোগের দ্বারা একজন বিশপ ভ্রাতৃসংঘভুক্ত সদস্য হয়ে ওঠেন"। বিশপ-পদের বৈশিষ্ট্য ও সঞ্জীয় প্রকৃতি, অন্যান্যদের মধ্যে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সেই প্রাচীন প্রথায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যেখানে নতুন বিশপের অভিষেক অনুষ্ঠানে একাধিক বিশপদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়।" আমাদের এই বর্তমান কালে বিশপের বিধিসম্মত অভিষেকের জন্য রোমের বিশপের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে, কারণ তিনিই হলেন একমাত্র খ্রীষ্টমণ্ডলীতে নির্দিষ্ট মণ্ডলীগুলোর মিলন-সংযোগের সর্বোচ্চ দৃশ্যমান বন্ধন এবং বিশপদের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদানকারী॥

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

সাধারণ কালের ষোড়শ রবিবার

১ম পাঠ : প্রজ্ঞা পুস্তক ১২:১৩, ১৬-১৯

২য় পাঠ : রোমিও ৮: ২৬-২৭

মঙ্গলসমাচার: মথি ১৩: ২৪-৪৩

একবার দুই বন্ধু ভালো এবং মন্দ সমুদ্র ভ্রমণে গেল। তারা সমুদ্রের দৃশ্য দেখে খুবই আনন্দিত হল। তাদের সমুদ্রে স্নান করার ইচ্ছা জাগলো। মন্দ বন্ধু ভালো বন্ধুকে বলল- চল আমরা গোসল করি। যে কথা সেই কাজ তারা দুই বন্ধু সমুদ্রের তীরে তাদের সব জামা কাপড় খুলে রেখে গোসল করতে লাগল। তারা জলে গোসল করে খুব আনন্দ অনুভব করল। হঠাৎ করে মন্দ বন্ধু ভালো বন্ধুকে বলল, বন্ধু আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। সমুদ্রের এত সুন্দর জলে তুমি গোসল কর, আমি যাই। এই বলে মন্দ বন্ধু সমুদ্র থেকে উঠে এল এবং ভালো বন্ধুর পোষাক পরে চলে গেল। বেশিরভাগ তাকে ভালোবন্ধু মনে করে অনুসরণ করল এবং তাদের জীবনের মূল্য অর্থাৎ ভালো দিকগুলো তারা হারিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পরে ভালো বন্ধুও সমুদ্র থেকে উঠে এল, কিন্তু সে তার পোষাক আর খুঁজে পাচ্ছে না। তাই কোন উপায়ান্তর না দেখে মন্দ বন্ধুর পোষাক পরে চলে গেল। সবাই তাকে মন্দবন্ধু ভেবে আর তাকে অনুসরণ করল না।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, এই পৃথিবীতে দু'টো শক্তি বিদ্যমান ভালো এবং মন্দ শক্তি। ভালো শক্তি হল পবিত্রাত্মার শক্তি। আর মন্দ শক্তি হলো শয়তানের শক্তি। যখন আমরা ভালো শক্তি অর্থাৎ পবিত্রাত্মার শক্তি দ্বারা চালিত হই তখন আমরা জীবনের পথে এগিয়ে চলি। অন্যদিকে যখন আমরা মন্দ শক্তি দ্বারা চালিত হই তখন আমরা আমাদের জীবনকে ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করি। আজকের বাণী পাঠ আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করে আমরা যেন ভাল শক্তির দ্বার পরিচালিত হয়ে গমের দানার মত হয়ে উঠি। অন্যের জন্য সুন্দর সেবাকাজ করি।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বদা আমাদের প্রতি দয়া করেন। আমরা বিপথে পরিচালিত হলেও তিনি চান আমরা যেন আমাদের মনের পরিবর্তন করি সর্বদা সত্য সুন্দর ও ন্যায্য পথে এগিয়ে চলি। মানুষের মধ্যে আবেগ রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ নিজেদের বিপথে পরিচালিত করে। সমাজের মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে লোভ অনেক বেশি কাজ করে। তাই লোভের বশবর্তী হয়ে নিজে মন্দের দিকে ধাবিত হয়। অন্যকেও সেই পথে চলতে উৎসাহিত করে। বর্তমানে মানুষ নিজেকে নিয়ে অনেক ব্যস্ত। শুধুমাত্র নিজের নিজের করে। তাই অনেক ক্ষেত্রে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাও ভঙ্গ করে। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ভালো করার প্রবণতা রয়েছে। যদি সে একবার ভালো করার সুযোগ পায় তাহলে সে ভালো করবেই। কিন্তু মানুষ অন্যের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। শ্যামা ঘাসের মত অন্যদের কষ্ট দিচ্ছে।

গম একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। এই ফসলের জমিতে আগাছা অর্থাৎ শ্যামাগাছ আপনা থেকেই উৎপন্ন হয়। এই শ্যামা গাছ মাটির উর্বরা শক্তি নষ্ট করে গমকে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে বাঁধা দেয়। ঠিক তেমনি ভাবে মন্দশক্তিও আমাদের জীবনকে ভালোভাবে বেড়ে উঠতে বাঁধা দেয়। আমাদের জীবনে অনেক ধরনের শ্যামাঘাসের বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমাদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠা থেকে বিরত রাখে।

মানুষের মধ্যে ভাল ও মলিন দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মলিন বৈশিষ্ট্যগুলো হলো আমাদের জীবনে শ্যামা ঘাস। যা আমাদের জীবনের ভাল দিকগুলোকে নষ্ট করার চেষ্টা করে। মিথ্যা কথা বলা, অন্যকে ঘৃণা করা, ঈর্ষা, পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা, অন্যায্য বিচার, অন্যকে গ্রহণ না করা, ক্ষমা না করা, ভালো না বাসা, লোভ, কাম, ঘৃণা, স্বার্থপরতা এগুলো হলো আমাদের জীবনে শ্যামা ঘাস। এই শ্যামাঘাসগুলো আমাদের জীবন থেকে উপড়ে ফেলতে হয় যেন আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে বিকশিত করতে পারি। যিশুর পথে চলতে পারি। শ্যামাঘাস বা মন্দতা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জীবনকে প্রতারিত করে। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা আমরা অনেক সময়ই বুঝতে পারি না। মন্দতা সবসময় চাকচিক্যময় অবস্থায় এসে আমাদের প্রলুব্ধ করে। আমাদের বিপথে নিয়ে যায়।

জগৎ সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের এক মহান পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রভু যিশুর আবির্ভাব। ঈশ্বর বাণীর দেহ-ধারণ করে এই পৃথিবীতে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন। যিশু বলেন-"আমি পথ, সত্য ও জীবন।" যিশুকে অনুসরণ করলে, তাঁর আদেশ পালন করলে, তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করলে মানুষ শুধু অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে না বরঞ্চ সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে। মন্দতা থেকে দূরে থাকতে পারে।

বর্তমান জগতে মানুষের মধ্যে মনে হয় শ্যামা ঘাসের বৈশিষ্ট্যই বেশি প্রকাশিত হচ্ছে। তাই তো সর্বত্রই দেখা যায় স্বার্থপরতা, ঈর্ষাপরায়ণতা। ন্যায্যতা, সত্যবলার প্রবণতা আজ যেন পদদলিত। আস্তে আস্তে সর্বত্র যেন মন্দতার পাল্লা ভারী হয়ে উঠছে। যিশু জীবন দিয়েছেন আমার জন্য। তিনি মন্দতাকে জয় করেছেন। জাগতের বাস্তবতায় ভালো মন্দের সমাবেশ থাকলেও খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের গুণে আমরা নিশ্চিত জানি যে, খ্রিস্টের আত্মার বশে চললে মন্দের উপর আমাদের জয় সুনিশ্চিত। এ জগতে মন্দতা আছে জেনেও প্রভু যিশু তাঁর শিষ্যদের এ জগৎ হতে সরিয়ে নেননি, বরং পিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন মন্দকে তারা জয় করতে পারেন। বস্তুত: মন্দ আছে বলেই ভালোর স্বীকৃতি আছে। পাপময় স্বভাবকে জয় করার সাধনায় ব্যাপৃত হয়েই মানুষ তার যোগ্যতা প্রমাণ করে। যে ছাত্র পরীক্ষাকে ভয় পায় সে কোনদিন পাশ করার আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। পক্ষান্তরে যে পরিশ্রম করে পড়াশুনা করে পরীক্ষা দেয় সে তার যোগ্যতা প্রমাণ করে এবং পাশ করার গৌরব লাভ করে। শ্যামা ঘাস হলো মন্দতার প্রতীক। সমাজে ভালো কাজকে নস্যাৎ করার জন্য দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্র সর্বদা অব্যাহত। আবার মানুষের নিজের মধ্যেও দেখা যায় ভালো মন্দের দ্বন্দ্ব। আমরা নিজেরাই অনেক সময় যা ভালো বলে জানি তা পালন করি না, অথবা মন্দ জেনেও তাকে এড়িয়ে চলি না।

খ্রিস্ট দেহধারণ করে পাপময় জগতে এসেছেন মানুষের পরিত্রাণ করতে। তাঁর স্থাপিত মণ্ডলী জগতে শত বাঁধা-বিপত্তি, কষ্ট নির্যাতন স্বীকার করেও খ্রিস্টের পরিত্রাণ বিতরণ করার কাজে নিয়োজিত। খ্রিস্টের নীতি ও মূল্যবোধ জগতের মূল্যবোধ হতে স্বতন্ত্র, সেহেতু মণ্ডলী কণ্টকশূন্য হতে পারে না। তবে খ্রিস্ট যেমন ক্রুশমৃত্যুর দ্বারাই জগতকে জয় করেছেন, ঠিক সেভাবে কষ্ট নির্যাতনের মধ্যদিয়ে মন্দকেও জয় করে মানুষের পরিত্রাণ সাধন করতে হয়। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে চলতে গেলে মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসবেই। সোনাকে যেমন আগুণে পুড়ে খাঁটি হতে হয় তেমনি মানুষকেও দুঃখের অনলে পুড়ে খাঁটি হতে হয়। কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে, কেষ্ট আসলে জীবনে স্বার্থকতা আছে। তাই আমরা প্রত্যেকে যেন যিশুর ক্রুশের দিকে তাকিয়ে দুঃখ কষ্টকে গ্রহণ করে মন্দতাকে জয় করতে পারি। সর্বদা সত্য ও ন্যায্যতার পথে অর্থাৎ যিশুর পথে চলতে পারি॥

দাদু-ঠাকুরমা, নানা-নানী: পরিবারে ঈশ্বরের আশীর্বাদ

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ

যদি এমন প্রশ্ন করা হয়ে যে, আমাদের পরিবারে বিশেষত শিশু-কিশোরদের আশ্রয়, প্রশয়, আবদার, অভিযোগ, অনুনয়, চাহিদা, মান-অভিমান, রাগে, অনুরাগে, দুঃখে সান্ত্বনার আধার কে? তাহলে আমাদের উত্তর কি হবে? ভাবছেন মা? না গ্রাণ্ডমা? একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন তো? দ্বিধা দ্বন্দ্বের কিছুই নয়। একটু খেয়াল করুন! যে পরিবারের ঠাকুরমা-ঠাকুরদা বা নানা-নানী আছেন, শিশুরা তাদের আবদার নিয়ে কার কাছে গিয়ে ঘেঁষে? অবশ্যই পরিবারের এই বয়োজেষ্ঠ মানুষদের কাছেই। বয়সের হিসাবে তাদের দূরত্ব অনেক বেশি। কিন্তু স্বভাবে তারা উভয়েই শিশু কিংবা উভয়য়েই বয়স্ক (আচরণে শিশুসুলভ)। এমন অনেক পরিবারেই আছে শিশুদের আদর করে বুড়ি কিংবা বুড়া ডাকে আবার বয়স্ক মানুষ যারা আছেন তাদেরকে বুড়ো খোকা/খুকী কিংবা বুড়ো বা বুড়ি শিশু বলে ডাকা হয়। বয়সের ব্যবধানে তারা দুই প্রজন্মের মানুষ। এক প্রজন্ম অভিজ্ঞতায় পূর্ণ, বয়সের ভারে নুজ্যমান। আর এক প্রজন্ম বয়সে একেবারেই নবীন এবং জীবনের প্রথম ধাপে অভিজ্ঞতা শূন্য এক আনাড়ী মানুষ। প্রতিনিয়তই জিজ্ঞাসার দৃষ্টি মেলে, আগ্রহের তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। অদম্য জানার আগ্রহে প্রশ্নবানে ত্যক্ত বিরক্ত করে করে সম্পর্কের নিবিড় জালে আটকে রাখে। এই শিশুদের যত প্রশ্নও এই বয়স্ক ব্যক্তিদেরই কাছে। দেখা যায় অনেক মেজাজী, রাগী, ধৈর্য্যহীন মানুষও তাদের নাতী-নাতীনদের এই নানা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন অসীম ধৈর্য্য নিয়ে শুনছেন এবং দাদু-ভাইয়ের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছেন আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন। কচি-কাঁচা আর বুড়ো-বুড়িদের এই হৃদয় কাড়া সখ্যতা পরিবারের সবার মধ্যে অনাবিল আনন্দের লহরী বয়ে দেয়। তাদের এই প্রাণ চঞ্চলতা পারিবারিক নৈম্যক্তিক স্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রতিনিয়ত মুগ্ধতা ছড়ায় পরিবার-পরিজনে।

আমাদের পারিবারিক জীবনে এই এক আশ্চর্য ছবি আমরা লক্ষ্য করি। যেখানে অন্য সব জায়গায় আমরা সমতা রক্ষার জন্য বয়স বা অন্য সব কিছুর পার্থক্য কমিয়ে আনার প্রাণপণ চেষ্টা করি, যেন দূরত্ব কমে আসে আর মনের মিল হয়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো হয়। আদান প্রদান সহজ হয়। কিন্তু এই একটি জায়গায় যেখানে বিস্তর ব্যবধান থাকার সত্ত্বেও আমরা কোন রকম দুশ্চিন্তা করি না, তাদের মধ্যে বোঝাপড়া বা মনের মিল অমিল নিয়ে কোন কিছু ভাববার অবকাশ পাই না। কারণ তারা (দাদু-ঠাকুরমা ও নাতী-নাতিন) যেন পরস্পরের পরিপূরক। দাদু-ঠাকুরমা ও নাতী-নাতিনদের মধ্যকার এক অনিন্দ্যময় হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। যেখানে তারা একজন আর একজনকে অতিসহজেই গ্রহণ করতে পারে, বহন করতে পারে। তাদের মধ্যকার সবধরনের বিষয়গুলিই প্রকৃত পক্ষে বিস্তর তফাৎ; কিন্তু কি এক অজানা যুক্তিতে তাদের মধ্যে সকলই সহজ, সকলই গ্রহণযোগ্য, সবই মানানসই।

পরিবারে বয়োজেষ্ঠ তথা ঠাকুরমা, দাদা-দাদী, নানা-নানী তারা আমাদের জন্য ঈশ্বরের এক বড় আশীর্বাদ। পারিবারিক জীবনে তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, বটবৃক্ষের ন্যায় পরিবারকে ছায়া দান করে, বড় বড় লম্বা, শক্ত শিকড় দিয়ে পরিবারকে আঁকড়ে রাখে আর পারিবারিক সম্পর্ককে গভীর করে তোলে। পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে তাদের অবদানের গুরত্ব অপরিসীম। তাদের সঙ্গে নাতী-নাতনীদের সম্পর্ক খুবই মধুর হয়। একটা বয়সে মানব শিশু (আমরা সবাই) তাদের দাদু-ঠাকুরমাদের আশ্রয়ে ও তাদের পরিচয়েই বেড়ে ওঠে। পরিবারে, গ্রামে, সমাজে তাদের নামে বা পরিচয়েই তারা পরিচিতি লাভ করে। যখন আমাদের পরিচয় দেওয়ার মত একান্ত নিজস্ব কিছু থাকে না, তখন আমরা নিজেদের তাদের দ্বারাই প্রকাশ করি। আমি খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের পরিচয় দিই, এই বলে যে, অমুকের নাতি বা নাতনি। আমরা কিন্তু তাদেরই উত্তরাধিকার। প্রকৃত পক্ষে তখন আমাদের নিজস্ব কিছু থাকে না। একটা চারা গাছ যেমন মাটির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার সমস্ত রসদ মাটি থেকেই সংগ্রহ করে এবং মাটিতেই তার শিকড় মেলে দিয়ে, মাটিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে। আমরাও ঠিক তাই করি। আমাদের গোটা জীবন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পুরোটাই তাদের উপর নির্ভরশীল। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহ্য চেতনা নিয়েই আমরা বেড়ে ওঠি।

তারা আমাদের জীবনে সত্যিই এক মহা আশীর্বাদ হয়ে থাকেন, কেননা তাদের মধ্যদিয়েই আমরা আমাদের পিতা-মাতাদের পাই এবং আমাদের পিতা-মাতা যে আমাদের ভালোবাসেন এবং আমাদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করেন, এই সব তারা ওনাদের কাছ থেকেই শিখেছেন। তারা যখন শিশু ছিলেন তাদের প্রতি তারাও এইভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের ছাড়া আমাদের পিতা-মাতারাও কেউ না, কিছু না। কোন সম্পদেরও মালিক নন তারা। আমাদের পিতা-মাতাগণও তাদের উপরই নির্ভরশীল। পিতা-মাতাগণ যে শিক্ষা আমাদের দেন, যে ভালোবাসায় আমাদের লালন পালন করেন, তাদের যে বৈষয়িক ও অন্যান্য সম্পদের ভাগিদার তারা আমাদের করেন এগুলি সবই তাদের কাছ থেকেই পাওয়া।

আমাদের দাদু-ঠাকুরমা, নানা-নানী, পারিবারিক শিক্ষা ও ঐতিহ্য তারা লালন পালন করে, প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধ করেন এবং এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের কাছে তারা তা হস্তান্তর করেন। তারা হলেন আমাদের বিশ্বাসের পথ প্রদর্শক। ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক মূল্যবোধ তারা শিক্ষা দেন। পরিবারের ছোটদেরকে বিশেষত নাতি নাতিনদের তারা সব ধরণের আদব কায়দা ও ধর্মীয় শিক্ষাদান করেন। তাদের শিক্ষাদানের কৌশলও অত্যন্ত কার্যকরী। কেননা তারা তো কোন তাত্ত্বিক বা বই পুস্তকের মুখস্ত বুলি আওড়ান না। কিন্তু তারা তাদের জীবনাদর্শ ও অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তবিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা দান করেন। কিভাবে পিতা-মাতা ও বয়োজেষ্ঠদের সঙ্গে আচরণ করতে হবে, সমসাথীদের সঙ্গে তাদের আচরণ কেমন হবে, কথা বলার ধরণ ও কায়দা কানুন তারা বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষা দেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, অনেক দাদু-দিদাই তাদের নাতি বা নাতনিদের সঙ্গে নিয়ে নানা স্থানে বেড়াতে যান বা পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করতে যান। যখন তাদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়, তখন তারা খুবই সুন্দরভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন 'এটা তোমার অমুক হয়, নমস্কার কর, আশীর্বাদ নাও' এইভাবে যত্ন করে হাতে কলমে শিক্ষা দেন। যৌথ পরিবার বা একক পরিবারে যেখানে দাদু ঠাকু উপস্থিত সেখানে শিশুরা তাড়াতাড়ি সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে। তাদের আর আলাদা করে আর মণ্ডলীর প্রার্থনাগুলি শিখাতে হয় না। পরিবার থেকেই তারা তা শিখে নেয়। শিশুদের মুখে বুলি ফোটার দিন থেকেই তারা তাদের ক্রুশের চিহ্ন করতে শিখায়, বিভিন্ন প্রার্থনা গুলি শিখায় ও একসঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা করে। হাত ধরে ধরে যেমন হাঁটতে শিখায়, তেমনি হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্রুশের চিহ্নও করতে শেখায়। তাদের মধ্যে ধর্মীয়বোধ ও নৈতিক উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন এই বয়স্ক দাদু ঠাকুরমাগণই।

দাদু-নানুরা আমাদের পরিবারের শিশুদের সর্বসময়ের সাথী। পরিবারে শিশুদের অবসর যাপন ও বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন তারা। শহরে বা গ্রামে এমন অনেক পরিবারই

আছে যেখানে পিতা-মাতা নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, সেখানে দাদু-ঠাকুরমা তাদের সঙ্গী হয়ে থাকেন সারা বেলা। তারা পরিবারে পিতা-মাতাদের সঙ্গে শিশুদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন। পিতা-মাতার উপস্থিতিতে এবং অনুপস্থিতিতে উভয় সময়ই তারা অভিভাবক বা সহ-অভিভাবকের ভূমিকায় থাকেন। তারা শিশুদের পরিচর্যা করেন। অনেক দাদু-ঠাকুরমাকেই দেখা যায় ঘরের বাইরে এবং ভিতরে আনন্দের সাথে শিশুদের প্রতি নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে। তাদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া ও স্কুল থেকে নিয়ে আসা, এমন কি তাদের স্কুলের ব্যাগও তারা বৃদ্ধ বয়সে স্বাচ্ছন্দ্যে বহন করেন। গ্রামে ছোট্ট শিশুকে গোসল করিয়ে, গায়ে তেল মেখে, খাবার খাইয়ে তাদের ঘুম পাড়ানো তো ঠাকুরমা-দিদিমাদের একটা বড় কাজ বলেই তারা ধরে নেয়, এবং সময় মত এইগুলি করতে পারাকে তারা তাদের পরম দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসার পরিচায়ক বলেই মনে করেন। এমন কম বাঙ্গালী শিশুই পাওয়া যাবে, যারা ঠাকুরমা'র ঘুম পাড়ানি গান শুনে শুনে ঘুমায়নি। ছুটির বৃষ্টির দিনে অখণ্ড অবসরে নাতী-নাতিনদের সঙ্গে লুডু খেলায় মত্ত দাদু-ঠাকুদের বিনোদন উল্লাস করতে দেখা যায়। অলস দুপুরে রূপকথার গল্প বলে কাটিয়ে দেন সারা বেলা। অবসর বিনোদনে অকৃত্রিম ভালোবাসায় পরস্পরকে অনুসঙ্গ করে কেটে যায় তাদের আনন্দক্ষণ।

দাদু-ঠাকুরমা/নানা-নানীদের সঙ্গে নাতী নাতীনদের থাকে এক বিশেষ সম্পর্ক। ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার ক্ষেত্রে তারা আদর্শ, তারা উত্তম পরামর্শদাতা। তাদের জীবনই পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বড় দৃষ্টান্ত। তাদের দৈনন্দিন জীবন কার্যক্রম নাতী-নাতীনদের অন্তরে গেঁথে থাকে। তাদের কাছ থেকে তারা জীবনাচর ও মূল্যবোধ শিখে। সত্যিই পরিবারের শিশুদের জন্য এক বড় পরামর্শ দাতা তারা। তারা হলেন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার। দীর্ঘ জীবনে নানারকম চড়াই উৎড়াই পার করে, তারা বুঝতে পারে সঠিক পথ কোনটি এবং তারা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেইভাবেই দিকনির্দেশনা দেয়। জীবনকে সঠিকভাবে গড়ার জন্য নানারকম শিক্ষা তারা দেয়। প্রতিদিনকার জীবন সচল রাখার জন্য নানারকম হাতের কাজগুলি পরিবার থেকে তারাই শিখিয়ে দেন। পারিবারিক, সমাজ সংসারের নানা বিষয়ে বাস্তবিক জ্ঞান দান করে, তারাই হয়ে ওঠেন প্রকৃত শিক্ষক-শিক্ষিকা।

পরিবারে শিশুদের কাছে তাদের দাদু-ঠাকু অনেক প্রিয়। তারাই শিশুদের আদর ভালোবাসা প্রশ্রয় দেয়। পরিবারের জন্য তাদের রয়েছে অফুরন্ত ভালেবাসা। তারা শুধু ভালোই বাসেন না, প্রয়োজন তারা ভুলের সংশোধন করেন, শাসন করেন এবং জীবন গড়ে তোলার জন্য তাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বের করে আনেন অনেক অনেক সঠিক দিক নিদের্শনা। একটা পরিবারে তারা হয়ে ওঠেন একজন আদর্শ অভিভাবক, পরামর্শদাতা, শিক্ষক, নির্দেশক, সংস্কারক ও পিতা-মাতা। এই বয়স্ক মানুষগুলি সারা জীবন তাদের আপনজনদের জন্য পরিশ্রম করেন এবং জীবনের শেষ বেলায় প্রিয়জনদের হাত ধরে তাদের সান্নিধ্যে আনন্দে থাকতে চান। তাদের চাহিদা আর খুব বেশি থাকে না। একটু খোঁজ খবর করলে, নাতী-নাতিনদের কাছে পেলেই তারা বেজায় খুশী থাকেন।

যদিও আমাদের বেশির ভাগ পরিবারই, পরিবারের এই বটবৃক্ষদের সঙ্গে ভালো আচরণ করি, তাদের প্রতি যত্নশীল। তবুও এমনটাও দেখা যায় যে, আমাদের কিছু কিছু পরিবার এই গুরু ব্যক্তিদের গুরুত্ব বুঝতে পারে না। অনেক পরিবারই তাদের বুড়া-বুড়ি বলে অবহেলা করে। তাদের সারা জীবনের অর্জন, তিল তিল করে তাদেরই গড়ে তোলা, তাদেরই এই সংসারে আমরা বসবাস করেও তাদের মূল্যায়ন করি না। কিছু কিছু পিতা-মাতা আছেন তাদের সন্তানদের এই দাদু-ঠাকুরমা, নানা-নানীদের সংস্পর্শে যেতে দেন না। তাদের এড়িয়ে চলেন। এতে তারা কষ্ট পায় এবং আমাদের সন্তানেরাও তাদের আদর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। আমাদের পিতা-মাতাদের উচিৎ তাদের সন্তানদের, তাদের দাদু-ঠাকুমা, নানা-নানীর সান্নিধ্যে রাখা। আধুনিক যন্ত্রপাতি মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্যাড কিংবা ডিজিটাল নানা ডিভাইসের সংস্পর্শের চেয়ে দাদু-ঠাকুরমা, নানা-নানীর গায়ের গন্ধ, তাদের আদর-মাথা আলিঙ্গণ স্পর্শ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আরো বেশি মধুময়। আমাদের দাদু-ঠাকুরমা, নানা-নানীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া, আমাদের জন্য এক মহা মূল্যবান উপহার, সংসারে তাদের উপস্থিতি আমাদের সকলের জন্য ঈশ্বরের এক অমেয় আশীর্বাদ। আমরা যেন তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করি, তাদের অবদানকে অস্বীকার না করি, তাদের মূল্যায়ন করি, তাদের প্রতি যত্নশীল হই। আমাদের হৃদয় মাঝারে যেন এই কথা বাজে, করিব যত্ন গুরুজনে, দাদু-ঠাকুরমা আর নানা-নানীগণে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ লইব শতগুণে॥

অস্তগামী

অমিয় জেমস এসেনসন

ইংরেজী "How old is the baby?" ভাষানুবাদ করে বলা যেতে পারে শিশুটি কতটুকু বুড়ো? যদিও আমরা সেভাবে কখনও বলি না এবং তা শুনতেও ভাল লাগে না। কিন্তু বাস্তবতা হল জন্মের পরই আমরা বুড়ো হতে শুরু করি- আমরা স্বীকার করি বা না করি। যতক্ষণ আমাদের শরীরে শক্তি ও সামর্থ আছে ততক্ষণ আমরা অনেকেই সেটা সহজে মেনে নিতে চাই না যে প্রতিদিন আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের জীবনের শেষ বিকেলের দিকে। শিশু থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধ হওয়া মানব জীবনে একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ আমরা শিশু হয়ে জন্মেছি এবং বৃদ্ধ অবস্থায় ইহজীবন থেকে প্রস্থান করব যদি না আমরা কোন দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে না পড়ি। তবে মানবজীবনের এ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বুড়ো হওয়ার বাস্তবতা আমাদের অনেকের জন্য রূঢ়, নীরব এবং তীব্র কষ্টের। আমরা অনেকেই সে বিষয়টা জানি না আবার জেনেও খেয়াল করি না।

গত প্রায় এক দশক ধরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছাকাছি থেকে অনেক কিছু উপলব্ধি করেছি ও জেনেছি। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় তখন এক পর্যায়ে তারা আবার শিশুর মত হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হল আমরা যেমন শিশুর প্রতিটি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ঠিক ততটাই অসচেতন আমরা আমাদের বৃদ্ধ আত্মীয়স্বজনদের প্রতি। দৈহিক আকৃতির দিক থেকে শিশু ছোট আর একজন বৃদ্ধ বড়। কিন্তু তাদের উভয়ের প্রয়োজনই প্রায় এক রকম হয়ে যায়। খাওয়ানো, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আদর-যত্ন, সান্নিধ্য, সুন্দর ব্যবহার, ইত্যাদি সবকিছু শিশু ও বৃদ্ধ উভয়ের জন্য কম-বেশি একইভাবে প্রয়োজন। কিন্তু আমার শিশু সন্তানের জন্য যে মনোযোগ তা আমার বৃদ্ধ মা-বাবা বা দাদা-দাদীর জন্য নেই। তার একটি প্রধান কারণ হল, মনস্তাত্ত্বিক ভাবে আমরা ধরেই নেই যে আমার মা-বাবা, দাদা-দাদী আগের মতই আছে এবং সবমসয় এক রকমই থাকবে। তাদের অন্য রকম আচরণ বা কথা আমরা মেনে নিতে পারি না, সহ্য করতে পারি না। অনেক সময় আমরা মনে করি তারা ইচ্ছে করে অন্য রকম আচরণ করছে, উল্টোপাল্টা কথা বলছে, পেরেও না পারার ভান করছে। সত্যটা হল: আমরা যে কোন পেশার বা জীবন ধারার হইনা কেন, জীবনের শেষ ভাগে সকল বৃদ্ধ মানুষের মধ্যে একটা সমতা চলে আসে, যেমন সমতা থাকে জন্মের পর সকল শিশুর ক্ষেত্রে।

স্বাস্থ্যগতভাবে চিন্তা করলে বৃদ্ধ বয়সের একজন ব্যক্তিকে আমরা সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণীর যে কোন একটিতে বিবেচনা করতে পারি। প্রথমটি হল মানসিক ভাবে সুস্থ কিন্তু দৈহিক ভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়টি হল দৈহিক ভাবে সুস্থ কিন্তু মানসিক ভাবে অসুস্থ বা ভারসাম্যহীন। আর তৃতীয়টি হল মানসিক ও দৈহিক উভয়ভাবেই অসুস্থ বা ভারসাম্যহীন তাই উভয় ক্ষেত্রেই অপরের উপর নির্ভরশীল।

বৃদ্ধ বয়সে নানাবিধ কারণে মানুষ মানসিক ও দৈহিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা কম-বেশি সবাই জানি যে আমাদের মাথা- অর্থাৎ মস্তিষ্ক হল আমাদের শরীরের সমস্ত কার্যক্রমের কেন্দ্র। ইঞ্জিন ছাড়া যেমন একটি গাড়ি অচল ঠিক তেমনি সুস্থ মস্তিষ্ক ছাড়া একজন মানুষ মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বা অসুস্থ। সাধারণত মানসিক ভারসাম্যহীনতা হারানোর অন্যতম কারণ হল ছোট-বড় ব্রেইন স্ট্রোক অথবা মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কারণ। এ বিষয়ের উপর ক্লাশ করার সময় শিক্ষকের কথায় আতকে উঠেছিলাম এ কথা শুনে যে আমাদের অনেকেরই ব্রেনে নাকি সূক্ষ্ম স্ট্রোক হয় যা আমরা বুঝতে পারিনা। অতি ছোট বলে তার প্রতিক্রিয়াও প্রায় বুঝা যায় না। তবে এক গুচ্ছ সূক্ষ্ম স্ট্রোক কিন্তু বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে যার ফলে আমরা মানসিক ভারসাম্যতা হারানোর পাশাপশি দৈহিক ভারসাম্যতা অর্থাৎ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে আমাদের শরীরের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারি। মনে না থাকা, আপন পরিবারের মানুষদের চিনতে না পারা, কথাবার্তা স্পষ্টভাবে বলতে না পারা, বেশি মাত্রায় রাগান্বিত হওয়া, ছোট-খাটো কারণে মারমুখি হওয়া, অতিমাত্রায় আবেগী হওয়া, খেতে আগ্রহী না হওয়া অথবা খুব বেশি বেশি খাবার ইচ্ছা পোষণ করা, নিজের সামনে কোন খাদ্য দ্রব্য আর কোনটা অখাদ্য তা চিনতে না পাড়া, হাত-পা সম্পূর্ণ ভাল থাকা সত্বেও নিজের মুখে খাবার তুলে নেয়ার অপারগতা, ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ আচরণ দেখা দিতে পারে মানসিক ভারসাম্যহীনতা ব্যক্তির ক্ষেত্রে।

উচ্চ রক্তচাপ, হৃদযন্ত্রের অসুস্থতা, ধুমপান, ডায়াবেটিস, রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টরল এবং পারিবারিক ইতিহাস, ইত্যাদি স্ট্রোকের প্রধান কারণ। তবে বিষন্নতা, একাকিত্ব, হঠাৎ মানসিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হওয়াও পরোক্ষভাবে স্ট্রোকের কারণ হতে পারে। তবে এখানে রোগের বিষয় বেফশ আলাপ না করে বরং রোগীর বিষয়েই বেফশ আলাপ করতে চাই। আলোচনার মূলে হল আমাদের বৃদ্ধ আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশি- সবাই।

প্রায় তিন দশক আগের কথা। এক বিকেলে দেখি আমার এক বৌদি রাগে-দুঃখে মাটির দেয়ালে মাথা ঠোকার মত অবস্থা। কারণ হিসেবে জানতে পারলাম প্রতিবেশি কেউ একজন আমাদের বাড়িতে এসেছিল যাকে আমার বড় ঠাকুমা (বাবার জেঠিমা) বলেছে তাকে খেতে দেয়া হয়নি। বড় ঠাকুমা খুবই "ক্ষুধার্ত" ছিল। তখন বৌদি ক্ষোভে ফুস্‌ছে। বিষয়টি কেমন একটু অন্যরকম মনে হল। ডাল, ভর্তা, মাছ বা মাংস যাই দিয়ে খাবার ব্যবস্থা হোক না কেন, আমরা তো অত পাষাণ হইনি যে বাড়ির মুরুব্বিকে বিকেল পর্যন্ত না খেয়ে রাখব। আবার খেয়েও বা কেন ঠাকুমা অস্বীকার করছে তাও বোধগম্য হল না সে সময়। কাকে দোষী মনে করব বুঝতে পারছিলাম না।

ঘটনা আরো কিছু আছে। যেমন, ঠাকুমা ঘরের মেঝেতে শুয়ে দুয়ারে কাউকে দেখলে মাঝে মধ্যে বলত তাকে যেন "হাছুন" (ঝাড়ু) দিয়ে একটি বাড়ি দিয়ে যায়। কোন দুঃখে ঠাকুমা তাকে ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি দিতে বলতেন তাও ঠিক বুঝা যাচ্ছিল না।

আজ অনেক দিন পর ঘটনাগুলো বেশ মনে পড়ছে। কারণ এখন এর চেয়েও অনেক আজব আজব ঘটনা প্রত্যক্ষ করি প্রতিনিয়ত। উপরোক্ত ঘটনার মত অনেকেই নানা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন বা এখনও হচ্ছেন। নানা বাস্তবতার স্বীকার হয়ে জীবন যখন দুর্বিষহ অথবা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত জীবন- তখন বয়োজেষ্ঠ্য কোন ব্যক্তির অবুঝ আচরণ বা পাগলামি আমাদেরকে অনেক সময় আরো বেশি ক্লান্ত করে দেয়।

বৃদ্ধ বয়সে অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার মধ্যে ডিমেনশা (Dementia) দেখা দিতে পারে। ডিমেনশা হল আস্তে আস্তে স্মৃতিশক্তি বিলোপ হয়ে যাওয়া এবং স্বাভাবিক চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা। ডিমেনশা হওয়ার ফলে একজন মানুষ অন্য একজন সুস্থ মানুষের মত দৈনন্দিন কাজকর্ম বা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। এ বিষয়ে না জানার ফলে অনেক সময় আমরা ডিমেনশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভুল বুঝি। মনে করি ইচ্ছে করে উল্টাপাল্টা কিছু করছে বা বলছে। ডিমেনশা যখন আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যেতে থাকে তখন ব্যক্তির পাগলামি বা উদ্ভট আচরণ আরো বাড়তে থাকে। তখন মানুষ তার স্নায়ুতান্ত্রিক, মানসিক ও সামাজিক বোধশক্তি আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলে। যতটুকু জানি, এখনও আমাদের বাংলাদেশ তথা এশিয় দেশসমূহে ডিমেনশা তত তীব্রভাবে দেখা দেয়নি। এ বিষয়ে কথা বলার সময় ক্লাশে শিক্ষক বলেছিলেন যে, সম্ভবত আমাদের খাদ্যাভাস ও জীবনযাপন প্রণালী অন্যদের তুলনায় ভিন্ন বলে আমাদের বৃদ্ধ বয়সের জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ একখনও ততটা স্মৃতিশক্তি হারায় না।

ডিমেনশাগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণ কতটা বিচিত্র হতে পারে তা একমাত্র কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করলে বুঝা যাবে। ডিমেনশার কারণে অতীত জীবন বর্তমানে পরিণত হয়। যত সময় পার হয় ডিমেনশা রোগী তত ছোট বেলার জীবনে ফিরে যেতে পারে। প্রথম প্রথম হয়তো দেখা যাবে আশি বছর বয়সের একজন বলছে যে, তাকে এক্ষুনি যেতে হবে তার ছয় বছর বয়সের ছোট শিশু ছেলে বা মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে। আবার দেখা যাবে নব্বই বছর বয়সের একজন কান্নাকাটি করছে তার মাকে না পেয়ে। দেখা যাবে নিজের ছেলেকে বলছে তার ভাই অথবা নিজের মেয়েকে বলছে তার পিশি। প্রতি পাঁচ মিনিট পরে পরে 'এখন ক'টা বাজে' জিজ্ঞেস করবে এবং বলার পরও প্রতিবারই ভুলে যাবে। সবেমাত্র খাবার খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই আবার ফিরে আসবে আর বলবে সে এখনও খায়নি। তবে রোগীকে অন্য স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ মনে করে তার ভুল ধরিয়ে দিলে উল্টো মারমুখী হয়ে উঠতে পারে অথবা ভীষণ দুঃখ পেতে পারে। ডিমেনশা রোগীর সাথে ধৈর্য ধরে কথা বলা উচিত। সরাসরি তার ভুল ধরিয়ে না দিয়ে সে যা বলছে সে সম্পর্কে আরো জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। যেমন সে যদি তার ছোট শিশুকে খুঁজতে থাকে তবে তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে তার শিশু সন্তানের নাম কি, সে দেখতে কেমন, সে কি খেতে পছন্দ করে, শিশুর কোন দিকটি রোগীর সবচে বেশি প্রিয়, ইত্যাদি। এসব জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে তার অস্থিরতা কেটে যাচ্ছে এবং শিশু সন্তানের কথা হয়ত ভুলে যাবে।

পৃথিবীর বাস্তবতা এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আমরা হয়ত অধৈর্য বা ক্লান্ত হয়ে যাই। সবকিছুর পরও সাধ্যমত আমাদের বৃদ্ধ আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশির প্রতি সুনজর থাকা উচিত। শুধু খাবার দেয়া বা সেবাশুশ্রূষা নয় সাথে সুন্দর ব্যবহার ও কথাবার্তাও তাদের জীবনকে অনেকটা মধুর করে তোলে। আমরা আজ যারা সুস্থ সবল আছি এবং এখনও বৃদ্ধ হইনি তাদের এটা মনে রাখা দরকার যে, স্বাভাবিক নিয়মে আমরা সবাই একদিন বৃদ্ধ হব, যদি না এর আগে ঈশ্বর আমাদের তুলে না নেন। সকালে উদিত সূর্য একটি সুন্দর দিনের সৃষ্টি করে তার সমাপ্তি ঘটায় সন্ধ্যায় অস্ত যাওয়ার মধ্যদিয়ে। ঠিক তেমনি আমাদের জীবন-সূর্য একবারই ওঠে জন্মের মধ্যদিয়ে এবং অস্ত যায় মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। আজ আমরা যারা জীবন নামক দিনের পূর্বাহ্নে আছি তাদের জীবনে অপরাহ্ন আসবে না তা ভাবা উচিত নয়। বরং একদিন সবাই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেব জীবনের অপরাহ্নে, সে কথা মনে রেখেই আমাদের সামনে যারা অস্তগামী তাদের প্রতি স্বশ্রদ্ধ নজর দেয়াই হোক আমাদের সকলের প্রচেষ্টা॥

পরিবারে প্রবীণা নারীর বাস্তবতা

আমুম মণ্ডল

কিছুদিন আগে আমি এক প্রবীণ মহিলার সাথে আলাপ আলোচনা করছিলাম যে, তিনি এই বয়সে অবস্থান করে কেমন আছেন? তার বর্তমান জীবনের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য আমি যে সমস্ত প্রশ্ন করি, তার প্রতি উত্তরে যেসব বিষয় খুঁজে পাই, তা নিয়েই আমার এই লেখা।

প্রবীণ মহিলার নাম (তেরেজিনা রর্বাট্স (ছদ্মনাম) বয়স ৬৫। তার স্বামীর নাম (প্রভুদান বিশ্বাস), যিনি ১০ বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। পরিবারে সদস্য সংখ্যা বর্তমানে দুই ছেলে সাথে দুই ছেলে বউ এবং প্রত্যেক সন্তানের ঘরে দুজন করে নাতি নাতনি আছে। একটি মেয়ে আছে যাকে গরীব ঘরে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় ছেলে ও বৌ গ্রামের বাড়িতেই থাকে। সে বিভিন্ন ঋতু অনুসারে বিভিন্ন পেশার কাজ করে।

দ্বিতীয় ছেলে মধ্যপ্রাচ্যে থাকে কিন্তু তার স্ত্রী দেশের বাড়িতে থাকে। বৃদ্ধা (তেরেজিনা রর্বাট্স) কথা অনুসারে সে এক মাস বড় ছেলের ঘরে এবং দ্বিতীয় মাস ছোট ছেলের ঘরে পর্যায়ক্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্রথমে তার শারীরিক অবস্থা জানতে চাইলে তিনি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলেন, তার বর্তমানে বাত ব্যথা, সারা গায়ে ব্যথা, সর্ব হাড়ের গিঁটে ব্যথা মাজায় ব্যথা, হার্টের ওষুধ খাচ্ছেন, গ্যাসের ওষুধ খেতে হয়, চুলকানির ওষুধ খাচ্ছেন, চোখে কম দেখছেন, চিকিৎসা দরকার ইত্যাদি। মাসে ৫০০ টাকা সরকারি ভাতা পান কিন্তু সে টাকায় তার ওষুধের ছয় ভাগের এক ভাগও হয় না। বাকি টাকা সন্তানদের কাছে চাইতে গেলে বিভিন্ন অজুহাতে টাকা নাই বলে সরে যায়। আবার মাঝে মাঝে কিছু হাত খরচ দেয়, কিন্তু ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুসারে ওষুধ খেতে পারেন না। অসুস্থতায় কাবু হয়ে পড়লে ছেলে বউদের কাছ থেকে উত্তর আসে যে তিনি ঢং করেন। উল্টো তাকে কাজ করার তাগিদ দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, খাবার সময় খাও তিন থালা, কিন্তু কাজ করো না। অথচ এই বৃদ্ধা অল্প কিছু ভাত খায় কারণ বেশি কিছু খেতে গেলেই গ্যাস্ট্রিক সমস্যা করে।

খাওয়া-দাওয়াতেও তাকে পরতে হয় সমস্যায়। ছেলে বউদের মন মতো করে তরকারি রান্না করা হয় যেটা তার শরীরে ফিট করে না। এমনকি করলার তরকারি রান্না করলে রাতে তা ঠাণ্ডা অবস্থায় খেতে দেওয়া হয় যেটা তার জন্য আরো বেশি সমস্যা হয়, কিন্তু কিছু বলতে পারেন না। খাবার ভালো না হলে উত্তর আসে, খাইলে খাবি, না খাইলে না খাবি।

তেরেজিনা শাশুড়ি হিসেবে যে সম্মানটুকু আশা করত, সেটা যদি কোন কারণেই ঝগড়ায় পরিণত হয় তাহলে ভাষা পাল্টে যায় যা তাকে কাঁদায়।

ছোট ছেলে মধ্যপ্রাচ্যে সামান্য কাজ করে হয়তো খুব বেশি একটা বেতন পায় না। সে-ই একমাত্র মাকে একটু ভালোবাসে কিন্তু দূরে থ াকার কারণে বাস্তবতা খুবই কঠিন। কারণ তার দুই সন্তানকেই শাসনের ত্রাসনে রাখে তাদের বউয়েরা। মা বিদেশে তার ছেলের সাথে কথা বলতে গেলে তাকে কথা বলতে বারণ করা হয় এবং ভাত না দেবার হুমকি দেওয়া হয়। আবার স্বামীকেও শাসন করা হয় যে, মায়ের সাথে কথা বললে বউয়ের সাথে কথা বলবি না। কাজেই ছেলেদের ক্ষমতা জি বাংলা এবং স্টার জলসার চরিত্রের মতোই যেখানে বউদের প্রাধান্য বেশি।

বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা বাড়িতে বউয়ের কাছে হিসেব থাকে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে হাত শূন্য হয়ে যায় এবং তা বউয়ের বাপের বাড়ি সাহায্য করার প্রবণতায় শেষ হয়ে যায় বলে তিনি জানান।

এই বৃদ্ধার স্বামীকে কোন এক ছেলে বউ অত্যাচার করেছে, পিটিয়েছে। পরিণামে সে অনেক কষ্ট পেয়েছে এবং অসুস্থ হয়েছে। হয়তো চিকিৎসা করলে ১০ হাজার টাকা লাগতো কিন্তু কোন ছেলে তা দেয়নি। তাই অন্তরের বোঝা থেকে নিরাময় লাভের জন্য তার কাছে থাকা বেশি পাওয়ারের কিছু ওষুধ খেয়েছে এবং সেই ওষুধের ক্রিয়াতে তার মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনার রেস ধরে পুত্রবধূরা তাদের শাশুড়িকে বলে যে, তোর স্বামীর মত করে তোকেও মারবো। এই বৃদ্ধা মহিলা জানান, বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হয়ে মাঝে মাঝে তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে। সে যেন শুধুমাত্র পৃথিবীতে একটু কোন রকম টিকে থাকার জন্য বেঁচে আছে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সংসার রক্ষার জন্য কিংবা সন্তানদের প্রতিপালন করবার জন্য যে দুঃখ-কষ্ট, অনাহার, অনিদ্রা, কান্নাকাটি সহ্য করেছেন, সে অনুপাতে বর্তমানে মোটামুটি মধ্যবিত্ত পরিবারে অবস্থান করেও সে আকাঙ্খিত কোনো সুখ পাচ্ছেন না।

তার কোন ছেলে বউ কোন এক ঝগড়ার মাঝে তার শাশুড়ি মাকে বলে ফেলে যে, তোমাকে দেখাশোনা করবো না, বর্তমান যুগে কেউ শ্বশুর-শাশুড়ি দেখেনা। এভাবেই তিনি আপনজনের মধ্যে বিচরণ করছেন কিন্তু কাউকেই আপন বলে ভাবতে পারছেন না।

পরিবারে কোনো কাজকর্ম করতে পারেন কিনা তা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, সকালে বিছানা ঠিক করি, ঘর ঝাড়ু দেই, রান্নার জন্য কল থেকে জল টেনে দেই, এভাবে হালকা হালকা কিছু কাজ করি নতুবা কথা শুনতে হবে, হয়তো ভাতও জুটবে না।

বৃদ্ধা তেরেজিনার তার দুজন প্রতিবেশি দেবর আছেন, তারা সবকিছু দেখেন কিন্তু কিছু বলেন না বা ছেলে বউদের ভয়ে বলতে পারেন না।

পরিবারে কোন বিনোদনের স্থান আছে কিনা প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন আমার জীবনে কোন নাতি-পুতি বা ছেলে বউ নিয়ে বিনোদন করার সুযোগ নেই। বিনোদনের মধ্যে ছেলে বউয়েরা বেশিরভাগ সময় টিভি সিরিয়াল নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর পেটে ক্ষুধা পেলে বাধ্য হয়ে রান্না ঘরে যায় রান্না করার জন্য। এছাড়া অন্য কোন কাজ বা বিনোদনের উৎস তার পরিবারে নেই।

বড় ছেলের ঘরে বা ছোট ছেলের ঘরে কখনো দিনের কোন সময় প্রার্থনা নেই। বৃদ্ধা শাশুড়ি

জীবনের ক্রুশ বহনের ফাঁকে মাঝে মাঝে কুমারী মারীয়ার কাছে, যিশুর কাছে প্রার্থনা করেন, যেন ঈশ্বর তার রোগ ব্যধি ভালো করে দেন। ছেলে ও ছেলের বউদের জন্য তিনি প্রার্থনা করেন যে, তিনি যে একজন সম্মানিত মানুষ, শ্রদ্ধেয় মানুষ, শাশুড়ি মানুষ, সেই জ্ঞান তাদের মধ্যে নেই, তুমি ওদের ক্ষমা করো। ওরা বোঝেনা, ওদের তুমি বুদ্ধি দান করো।

এই প্রবীণ মহিলার কঠিন অবস্থা খুঁজে বের করতে পারতাম তার জীবন কাহিনী থেকে। কিন্তু যতটুকু লিখতে পেরেছি এতোটুকু থেকে যা বুঝতে পারা যায়, দিন যতই সামনে যাচ্ছে মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শান্তি-শৃঙ্খলা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কমে যাচ্ছে।

যে কোনো পরিবার বা সমাজ যতই বড়লোক হতে চেষ্টা করুক না কেন, সেখানে যদি নৈতিক অধঃপতন এবং ধর্মীয় শিথিলতা থাকে সে পরিবার বা সমাজ কোনদিনও শান্তিতে সহাঅবস্থান করতে পারবে না।

বর্তমান যুগে শ্বশুর শাশুড়ি কেউ দেখেনা এসব কাল্পনিক কথাবার্তা আদৌ প্রাকৃতিক ন্যায্য কথাবার্তা না। কারণ আদিতে শ্বশুর-শাশুড়ি ছিলেন, এখনো আছেন এবং যারা যুবক-যুবতী হিসেবে বা ছেলে বউ হিসেবে জীবিত আছে যারা, তারাও একদিন শ্বশুর- শাশুড়ি হবেন। সবাইকে একদিন এই বৃদ্ধ বয়সে অবস্থান করতে হবে। এই বয়সে এসে টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ যতই জমা থাকুক না কেন, কিন্তু পরিবারের সেবা, ভালোবাসা, সহযোগিতা, ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, রান্না করে খাওয়ানো, গোসল করানো, বাথরুম করানো, এসব কিছুই সবার জীবনে দরকার হবে। তাই সবাইকে অনুরোধ করব, ঈশ্বরের চিরাচরিত বিধান লঙ্ঘন করে দয়া করে কেউ যেন এমন সিদ্ধান্ত না নেন যে, বর্তমান যুগে শ্বশুর শাশুড়ি দেখতে হবে না। আপনি ভুল জীবনে আছেন অথবা আপনাকে আপনার জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দিতে কেউ সুযোগ পায়নি॥

BANGLADESH CHRISTIAN STUDENTS' HOSTEL
বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ছাত্রাবাস
99 Asadgate, Mohammadpur, Dhaka-1207,
Phone: 9145696 Mobile: 01711-244396
৯৯ আসাদগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন: ২২৩৩১০৩৮৭, মোবাইল: ০১৭১১-২৪৪৩৯৬

তারিখ: ২৩/০৬/২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ

ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

২০২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খ্রিস্টান ছাত্রদের জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ছাত্রাবাসে (আসাদ হোস্টেলে) নতুন ভর্তির জন্য কিছু সংখ্যক সীট/আসন খালি আছে। নতুন ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রদের আগামী ১৫ আগস্ট হতে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম সংগ্রহ করতে ও ভর্তি সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য হোস্টেল অফিস থেকে জেনে নিতে বলা হচ্ছে।

আবেদনকৃত ভর্তির ফর্ম যাচাই-বাছাই করার পর সাক্ষাতের গ্রহণের মাধ্যমে শুধুমাত্র এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ভর্তি করা হবে।

ধন্যবাদান্তে

হোস্টেল সুপার,
ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে
বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ছাত্রাবাস।
ফোন: ২২৩৩১০৩৮৭, মোবাইল: ০১৭১১-২৪৪৩৯৬

ভর্তির জন্য যা জমা দিতে হবে:
১) নিজ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের/পালকের চিঠি,
২) এসএসসি পরীক্ষার মার্কসীট বা নম্বরপত্র
৩) কলেজের ভর্তির রসিদ এবং কলেজের আইডি কার্ড (পরবর্তীতে)
৪) ৩ কপি পিপি সাইজ ছবি,
৫) জামানত ও ভর্তিসহ মাসিক বেতন।

বিজ্ঞ/২২৭/২৩

বিদেশে পড়াশোনা / মাইগ্রেশন / ভিজিট ভিসা

Canada/ Usa/ Australia/ Uk/ Japan/ S. Korea/ Malaysia & Schengen দেশ সমূহে ভর্তি ও ভিসার অপূর্ব সুযোগ! Canada-তে PNP/ Express Entry ও মাইগ্রেশন প্রোগ্রামে সহজেই যেতে পারবেন। শুধু মাস্টার ডিগ্রী পাশ ও অন্তত: ২/৩ বছরের Work Experience থাকতে হবে ।

* CANADA/ USA/ AUSTRALIA/ UK তে আমরা Bank Sponsorship ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করি।
* কানাডাতে আমরা আমাদের RCIC লাইসেন্স প্রাপ্ত Consultant এর মাধ্যমে PNP মাইগ্রেশন ভিসা প্রসেসিং করছি।
* আমরা USA/Canada-এর জন্য ফ্যামিলি ভিজিট/ ট্যুরিস্ট ভিসা প্রসেসিং করছি।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
YOUR DREAM, OUR RESPONSIBILITY

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01600-369521
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/২২৬/২৩

প্রবীণ জীবন ভাবনা

ডমিনিক ফিলিপ রিবেরু

আমার জন্ম ২০/০৮/১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। আমি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছি। অভাবের কারণে বেশিদূর পড়ালেখা করার সুযোগ হয়নি। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাবা মারা যাবার পর থেকেই আমাকে সংসারের হাল ধরতে হয়। জীবনে সব ধরনের কাজই করতে হয়েছে। বিদেশি সাহেবদের বাসায় (পার্বতীপুর ও ঈশ্বরদী) ৫ বছর, কারিতাসে (দিনাজপুর) ২ বছর কাজ করি এবং কৃষি কাজ করে পরিবার নিয়ে অনেক কষ্টে জীবন যাপন করেছি। আমি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছি। এছাড়া বনপাড়া প্যারিসে দীর্ঘ ৮ বছর কাটেখিস্ট এর দায়িত্ব এবং জমি-জমা সংক্রান্ত সহ বিভিন্ন বিষয়ে সেবা দায়িত্ব পালন করে আসছি।

বর্তমানে আমার বয়স ৮৪ বছর। আমি এখন একজন প্রবীণ। আসলে এই সময়টা কারো কাছেই সুখের নয়। যৌবনের সেই শারীরিক ও মানসিক শক্তি কোনোটাই আর থাকেনা। প্রবীণ পর্যায়ে এসে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও জটিলতা দেখা দেয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে সুস্থ রেখেছেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার বড় ধরনের কোন শারীরিক সমস্যা হয়নি। আমার সহ-ধর্মিনী ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গত হয়েছেন। তারপরেও আমি বলবো, ছেলে-মেয়ে, ছেলে বৌ, নাতী-নাতনীদের নিয়ে বেশ শান্তিতেই আছি। পরিবারের সকলেই আমার খোঁজ-খবর নেয় এবং আমার যত্ন করে। আমিও চেষ্টা করি বিভিন্ন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে। আমি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করি। সেই সুবাদে অনেকেই আসে আমার কাছে চিকিৎসা নিতে। এই কাজ করতে আমার ভালোই লাগে আর আমার সময়ও কাটে বেশ।

আমি নিয়মিত গির্জায় যাই, প্রার্থনা করি এবং প্রতিবেশীসহ বিভিন্ন ধরনের বই পড়ি। কারণ প্রার্থনা হচ্ছে আমার মনের শক্তি। তবে মাঝে মাঝে সবাই যখন নিজ নিজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন একটু নিঃসঙ্গতা অনুভব করি।

আমি দীর্ঘ দিন যাবত প্যারিসে ও সমাজে সেবা দায়িত্ব পালন করেছি, এখন সেই কাজ গুলো আর আগের মতো করতে পারিনা। তবে এখনও আমি প্যারিস নিয়ে, সমাজ নিয়ে ভাবি। যদিও বর্তমান বাস্তবতায় সমাজ গুলো আগের মতো নেই। আমরা প্রার্থনা থেকে সরে যাচ্ছি এবং হয়ে ওঠছি আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু আমি এখনও স্বপ্ন দেখি সুন্দর একটি সমাজের। সবাই আবার গির্জামুখী হবে, বাড়িতে বাড়িতে সন্ধ্যায় রোজারিমালা প্রার্থনা হবে, সবাই একসাথে মিলে- মিশে থাকবে, পরস্পরের প্রতি থাকবে সম্মান। তবে প্রবীণদের বাদ দিয়ে নয়। নবীন-প্রবীণ কাজ করবে একসাথে। গত সপ্তাহে ফাদার সুনীল দানিয়েল রোজারিও এর লেখা একটি প্রবন্ধ পড়েছি 'প্রবীণদের' নিয়ে। আমার অনেক ভালো লেগেছে। লেখাটি পড়ে আমার মনে একটি ভাবনা এসেছে। এমন অনেক গরীব পরিবার আছে যেখানে প্রবীণেরা অনেক অযত্ন এবং অবহেলা পায়, সঠিক চিকিৎসা পায়না। কিন্তু আমরা যদি প্রতিটা ধর্মপ্রদেশে একটি করে ফাণ্ড তৈরি করতে পারি, তাহলে গরীব-অসহায় প্রবীণদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

আমরা ছোটবেলা থেকে পরিবার থেকে, বিদ্যালয় থেকে এবং ফাদার-সিস্টারদের কাছ থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেছি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সন্তানেরা, নাতী-নাতনীরা বিপথে চলে যাচ্ছে। যা ভবিষ্যতের জন্য মোটেও শুভকর নয় এবং আমাদের কাম্য নয়। মোবাইল ফোন, বিভিন্ন ধরনের মাদক আমাদের সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই আসুন আমরা সবাই সচেতন হই। আমাদের সন্তানদের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষা দেই। আর প্রবীণদের প্রতি একটু যত্নশীল হতে এবং প্রবীণদের বোঝা না ভেবে বটবৃক্ষ ভাবতে সহায়তা করি॥

আমাদের জন্য আশীর্বাদ

সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ

মানুষ সামাজিক জীব। একসাথে দলগত ভাবে বসবাস করতে আমরা অভ্যস্ত। সে জন্যে একসাথে আমাদের প্রত্যেকের বসবাস। যদি একা একা কেউ থাকে তবে সেটা সমাজের অন্তর্ভূক্ত নয়। অর্থাৎ জীবনটা একীভূত। একা কেউ বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না। ব্যক্তি মিলে পরিবার, পরিবার মিলে সমাজ, সমাজ মিলে দেশ, দেশ মিলে বিশ্ব। এই পরিবার, সমাজ, দেশ এবং বিশ্বে আমাদের প্রত্যেকের অবস্থান।

একসাথে থাকা মানেই সেখানে থাকবে ভালোবাসা, আনন্দ, বেদনা, ভালোলাগা, ঝগড়া, মনোমালিন্য, বিবাদ, কথা কাটাকাটি, কথা বন্ধ, হিংসা, অহংকার, মারামারি, খুন, অন্যায় ইত্যাদি। তবুও কেউ সমাজ থেকে চলে গিয়ে এসব করে না। বরং সমাজের মধ্যে থেকেই চলে এসব কর্মকাণ্ড। কোন ব্যক্তি কিছু দিনের জন্যে অন্যত্র চলে গেলেও আবার কিন্তু ফিরে আসে পরিবারে।

পৃথিবীতে আমরা একই বয়সের, একই মনোভাবের মানুষের সাথে বসবাস করি না। সেখানে থাকে ছোট, বড়, বৃদ্ধ, অন্ধ, অসুস্থ বিভিন্ন জন ব্যক্তি। অর্থাৎ সবার সম্মিলিত অবস্থান। পরিবারে সবার সাথে আমরা সহাবস্থান করে থাকি। প্রবীণ ব্যক্তিরা আমাদের জন্যে আশীর্বাদস্বরূপ। তারা যদি না থাকত তাহলে আমার, আপনার অস্তিত্বই থাকত না। এ কথাটা আমরা স্বীকার করলেও মেনে নিতে চাই না। বরং পরিবারের বোঝা মনে করে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। তারা আমাদের জন্যে বোঝা নয় বরং আশীর্বাদ, আমাদের গুরুজন, আমাদের পরম বন্ধু। পরিবারে মা তার শ্বাশুড়ীকে বোঝা মনে করে কিন্তু নিজের মাকে বোঝা মনে না করে দায়িত্ব পালন মনে করে থাকে। এটাই আমাদের সমাজের, পরিবারের বাস্তবতা।

এই বয়স্ক বা প্রবীণ ব্যক্তিরাই কিন্তু আমাদের পরিবারের রক্ষক। কেউ কোথাও চলে গেলে তারা বাড়ী, ঘর দেখাশুনা করে থাকে। বাড়ি পাহাড়া দেয়। তারা তো কেউ ফেলে দেওয়ার বস্তু নয়। এমন কি ভুলে যাওয়ারও কেউ নয়। তারা তো আমার, আপনার একান্ত প্রিয়জন, আপনজন। কারো বা শ্বাশুড়ি, কারো মা, কারো বা দাদী, নানী, দিদিমা, নানা-নানী। কারো কিছু না কিছু তো অবশ্যই হয়। সুতরাং তাদেরকে ভুলে গেলে আমাদের চলবে না।

আজকে যারা শিশুদের সামনে তাদেরকে অবহেলা করছেন শিশুরা কিন্তু তা মনোযোগ দিয়ে দেখে রাখছে। ভবিষ্যতে তাদেরকে কি করতে হবে তা তারা শিখে রাখছে। এমনও তো হতে পারে বৃদ্ধ বয়সে ঠিক এরকম অবস্থা বা এর চেয়ে করুণ অবস্থা আপনার জীবনেও হতে পারে! সুতরাং এখনই সময় মন পরিবর্তন করার। আসুন বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে আমরা আরো ভালো ব্যবহার, ভাল আচরণ করি। যাতে তাদের আশীর্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত না হই। তাদের আশীর্বাদ আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে।

আসুন তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করি এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলি॥

নতুন মানুষের আবির্ভাব

স্বপন বৈরাগী

সৃষ্টির প্রারম্ভে মানব জাতিকে তাঁর স্বাদৃশ্যে তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীতে আবির্ভাব করলেন, তাকে দান করলেন, তাঁর উদ্দেশিত সকল পরাক্রমের সামর্থ ও শক্তিতে। তাই তো মানুষ পৃথিবীতে এসে তাঁর ইচ্ছানুসারে মানবীয় জীবন যাপনের অধিকার লাভ করেছেন। যখন একজন মানুষ এ পৃথিবীতে আসে, তখন তো ঐশ অনুগ্রহ প্রাপ্তির মধ্যদিয়েই পৃথিবীর সকল সৃষ্টির সৃষ্ট সমূহ গ্রহণ ও ভোগ করার অধিকার পায়, আর সে তো তাঁরই দান। তখন পৃথিবীর সকল কিছু ঐ মানুষকে সম্ভাষণ জানায়, যদিও স্রষ্টার ইচ্ছানুসারে একজন নর ও নারীর পবিত্র ভালোবাসার স্পর্শে এ মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, প্রক্ষান্তরে এই নর-নারীই ঐ মানুষটার পিতা ও মাতা রূপে পরিচিতি লাভ করেন। তখন স্রষ্টার ইচ্ছাতেই যে, মানুষটি শিশু রূপে পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়েছে-, তার লালন পালনের দায়ভার বহন করেন এই নর-নারীই।

শিশুটি যখন এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন এ মানব সংসারের সব মানুষ তাকে ভালোবাসে। এখন প্রশ্ন কেন মানুষ তাকে ভালোবাসে? শিশুটি মানব ও স্রষ্টার ভালোবাসার ফল, তাই কি হতে পারে? হ্যাঁ তাও হতে পারে! তবে শিশুটি ঐশ প্রাপ্ত শক্তিতে-যেমন এ পৃথিবীর সব কিছু গ্রহণ ও ভোগ করার অধিকার পেয়েছে, তেমনি মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষমতা পেয়েছে। দেখুন শিশুটি প্রথমে কোন কিছুই করতে পারেনা, তার নিষ্পাপ ফেল-ফেরানী চোখ ও তাকানো দেখে এবং হাসিতে তার পিতামাতাসহ আত্মীয়-স্বজন, এমন কি প্রতিবেশিরাও আকৃষ্ট হয়। প্রত্যেকে চায় শিশুটিকে স্নেহ,আদর, ভালবাসা দিতে, আর এই ভালোবাসার মধ্যে নেই কোন প্রতিদান, নেই কোন স্বার্থপরতা, আছে শুধু নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। কিন্তু এই স্বার্থ, অর্থ, লোভ লালসার উৎস কোথা থেকে, এর প্রতিফলন বা কিভাবে হল? মানুষের মধ্যে যে অপ-প্রতিযোগিতা, হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদ, মিথ্যাচার, সব কিছুই যেন নির্ভর করছে, আমার স্বার্থপরতা।

কোন কিছু যখন আমি করতে চাই, তখন আমি ভাবি প্রতিদানে কি পাব? যদি এই কাজ করি তাহলে আমার লাভ কতটুকু? হিসাব নিকাশে ব্যস্ত থাকি। তাহলে আমার ভালোবাসা কোথায়? ঐ স্বার্থ যেখানে! তাহলে নীতির কথা, নীতিশব্দ, নীতিবাক্য - এ সব তো আমি আমার আমিত্বের মধ্যে গুলিয়ে নিঃশেষ করে ফেলে চলেছি ঐ স্বার্থের মোহে। তাহলে কি নীতিবাক্য, নীতিকর্ম সবই কি স্বার্থ কর্মে রূপান্তর করছি? তবে যদি করেই থাকি, তবে তা নিতান্তই ভুল। কোন কিছু পাবার আশায় আমি বা আপনি যেই হোক না কেন যদি কিছু করি, তাহলে তার প্রতিদানে আপনার আমার প্রাপ্তি হবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছুই ব্যতিক্রম নয়। দেখুন, বর্তমানে আমরা যদি আমাদের পরিবার, সমাজ তথা দেশ, যা ভাবি না কেন সব জায়গাতেই যেন স্বার্থটাকে আগে এনে অনার্থ নিজেকে অপদার্থ করছি। কারণ স্রষ্টা তো এর জন্য আমাদের পৃথিবীতে আবির্ভাব করেননি বা জীবন শুরুতে এ অপ-নীতি অনুসরণ করাননি বা শিক্ষাও দেননি, তাহলে আমরা যা করছি তা কি ভুল করছি না? আমরা সকলে জানি, তারপরও স্বার্থবিহীন কোন কাজ করতে চাই না। সর্ব প্রসিদ্ধ-' অর্থ, স্বার্থ, অনার্থ"। কিন্তু সেই স্বার্থ হয়েছে আমাদের মূল পদার্থ, যার উপর আমরা সর্বদা শুধু নির্ভরশীল নয়, আত্ম-নির্ভরশীল বলেও হয় তো- বা ভুল হবে না। এখন আত্মনির্ভর শব্দটি ব্যবহার করে কেমন যেন সংশয় এর মধ্যে পড়েছি, আত্ম-নির্ভরশীল অর্থ তো হলো- স্বাবলম্বন বা নিজের প্রতি নির্ভরশীল। তাহলে কি আমরা স্বার্থপরতাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে ফেলেছি? হয়তো বা তাই, তা-না হলে ধর্ম পালনে স্বার্থ খুঁজছি, কর্তব্য পালনে স্বার্থ খুঁজছি, পরিবার পরিজনদের প্রতি দায়িত্ব পালনে স্বার্থ খুঁজছি, সমাজে কোন কাজ করতে স্বার্থ খুঁজছি, কোন প্রকার সেবা কার্যে স্বার্থ খুঁজছি, আতিথিয়তায় স্বার্থ খুঁজছি, সন্তান-পিতামাতার-প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালনে স্বার্থ খুঁজছি, রাজনীতিতে স্ব-স্বার্থ খুঁজছি, নিজ কর্মক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব পালনে স্বার্থ খুঁজছি, সর্বোপরি নিজের জীবন যেটি সৃষ্টিকর্তা আপনার আমার দান করেছেন, সে টি বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি? সেখানেও স্বার্থ খুঁজছি, আসলে আমাদের আমিত্বের মোহে-নিজেদের মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলেছি।

আবার মূল্যবোধের কথা বলে মনে হচ্ছে আর একটি বিপাকে পড়লাম, যেখানে নিজেদের মধ্যে নেই কোন বোধ-শক্তি, সেখানে মূল্যবোধ থাকবে কোথা থেকে? ছোট বেলা অনেক জ্ঞানী-গুণীজনের লেখায় পড়েছি বা শুনেছিলাম, মানুষের মূল্যবোধ নাকি দিনের পর দিন অবক্ষয় হচ্ছে। তখন "মূল্যবোধ" শব্দের অর্থ কি ? তা আমি বুঝতাম না। আর যখন থেকে বুঝে- শিখতে শুরু করেছিলাম, তখন মানুষের মূল্যবোধ অবক্ষয় এত দ্রুত বেগে হচ্ছিল যে, মূল্যবোধের মূলমন্ত্র হয়তো বা হারিয়ে ফেলতে বসেছে। আর বর্তমানে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ শব্দটি খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা হয়তো বা আমার মতো আপনারাও সংশয়ে পড়বেন। যদি মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ থাকত, তাহলে তো আজ যা ঘটছে- পিতার বিরুদ্ধে সন্তান, সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা, স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামী, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী, অর্থাৎ একজন অপর জনের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব কলহ বিরাজ করছে, তা কি কখনো হত?

আর এ সব কিছুই ঘটছে ঐ স্বার্থপরতা, আমিত্ব, ক্ষমতার দম্ভ নামে মানুষের মধ্যে যে অপশক্তি বিদ্যমান রয়েছে তারই তৎপরতা, তবে এ অপশক্তি কখনো বিজয়ী হতে পারে না। সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির সেরা মানুষকে মনুষ্যত্ববোধ দিয়ে পঠিয়েছেন বলেই মন-সত্যের, সত্যই বিজয় লাভ করবেন।

আমরা "মানুষ" আমাদের রয়েছে মায়ের স্নেহ, পিতার ভালোবাসা, স্রষ্টার আশিষ ও প্রেম বন্ধন। তাই মানুষ কখনও শয়তানের দাসত্ব মেনে নেয় না। তারা তাদের বোধ শক্তি দ্বারা অন্যায় এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। সে আনন্দোলন-স্বার্থহীন, বর্ণহীণ, গোত্রহীন, দলবিহীন সত্য প্রতিষ্ঠার। মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় নিঃস্বার্থ ভাবে আলিঙ্গন করবে, সেবা করবে, সহযোগিতার হাত বাড়াবে তবেই এ মানব জাতি স্রষ্টা প্রদত্ত সব কিছুই ভোগ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। আমরা যদি কোন ভাল কাজ করি, তাহলে বিনিময়ে কিছু পাব, এ কথা ভাবার কোন অবকাশ নাই। এ ভাবনা যদি থাকে, তাহলে প্রকৃতিগত ভাবেই আপনার আমার প্রাপ্তি হবে-দুঃখ, কষ্ট, ও ঘৃণা অপমান।

তাই আসুন আমরা নিজেদের সংশোধন করে নতুন ভাবে সাজাই। নিজেকে প্রমাণ করি নতুন মানুষের আবির্ভাব॥

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ : উত্তরবঙ্গের গর্ব

স্যামুয়েল পালমা

পাক-ভারত উপমহাদেশের দীর্ঘতম রেলওয়ে সেতুটি উদ্বোধন হয়েছিল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি, ভারতের বিহারের পুত্র (Son) নদীর উপর স্থাপিত (৩.১ কিমি), নেহেরু সেতু। তবে তখন (১৯০০) পর্যন্ত বিশ্বে সর্ববৃহৎ রেল সেতুটি ছিল আমেরিকার লুইজিয়ানায় যা লম্বায় ৯.৩ কিমি, উদ্বোধন হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে। তৃতীয় সহস্রাব্দে এসে বিশ্ব আজ অনেক এগিয়ে, বর্তমানে সর্ববৃহৎ রেলওয়ে সেতুর দৈর্ঘ্য ১৬৪.৮ কিমি, চিন দেশে। আর বিশ্বের যে দশটি বৃহত্তম রেলওয়ে সেতু আছে তার মধ্যে ৬টি-ই চিনে, প্রথম ৫টির মধ্যে ৪টি-ই সেখানে। দ্বিতীয়টি দখল করেছে তাইওয়ান ১৫৭.৩ কিমি। তবে এর ৯টি-ই চালু হয়েছে ২০০০ বা তার পরের খ্রিস্টাব্দগুলোতে। কিন্তু আমরা আজ যে গৌরবময় ঐতিহ্য প্রসঙ্গে আলাপন করতে এসেছি তা এ সহস্রাব্দের তো নয়ই, ১৯০০ শতাব্দীর শুরুর, উত্তরবঙ্গের গৌরব হার্ডিঞ্জ ব্রিজকে নিয়ে।

উল্লেখ্য, ৩য় জর্জের আমলে পাক-ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রথম ভাইসরয় ছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক ওয়ারেন হেস্টিংস, ২০ অক্টোবর ১৭৭৪-১ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৫ পর্যন্ত। আর ব্রিটিশ রাজ্যের শেষ রাজ্যপাল ছিলেন ভারতীয় নাগরিক বিশিষ্ট আইনজীবী, ভারতরত্ন উপাধিপ্রাপ্ত চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, ২১ জুন ১৯৪৮ থেকে ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ পর্যন্ত।

আগে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যাকে সারাঘাটের পুল বা ঈশ্বরদী পাক্শী ব্রিজ বা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নামে চিনতো সেটি তৎকালীন বৃটিশ শাসক পঞ্চম জর্জের ভাইসরয় (গভর্নর জেনারেল/রাজ্যপাল শ্রেণীর)-এর নামানুসারেই 'হার্ডিঞ্জ ব্রিজ' নামে খ্যাত। পাশের ছবিতে দেয়া সেই ব্রিটিশ রাজ্যের পাক-ভারতের ভাইসরয়ের নাম দ্য লর্ড হার্ডিঞ্জ অব পেনশার্স্ট, শাসনকাল ২৩ নভেম্বর ১৯১০-৪ এপ্রিল ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ।

পাবনা আর কুষ্টিয়া জেলাকে যুক্ত করেছে এই সেতু। পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশী ইউনিয়ন ও কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলাকে পাক-ভারত ইতিহাসের খাতায় সমৃদ্ধ করেছে। মূলত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য (পাশাপাশি পর্যটন) সাধনের জন্য পূর্ব বাংলার সাথে বাণিজ্যকেন্দ্র কলকাতার যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশেই, সেইসাথে অবিভক্ত ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরা, আসাম, নাগাল্যান্ড ও উত্তরবঙ্গের সাথে কলকাতা ও দিল্লীর যোগাযোগের জন্যই এই সেতুর পরিকল্পনা। তৎকালীন বাণিজ্যের প্রধান যোগাযোগের মাধ্যমে জলপথের জাহাজগুলো নারায়নগঞ্জ থেকে ছেড়ে সিরাজগঞ্জ ঘাট, ঈশ্বরদীতে পদ্মার পূর্ব পাড়ে সাড়াঘাট ও পশ্চিম পাড়ে রায়টা ঘাট (দু'পাড়েই বড় বন্দর ছিল) সহ ১৬টি ঘাট হয়ে বাণিজ্যিক কেন্দ্র কলকাতায় পৌঁছাতো। এই সংযুক্তিগুলোর কারণে এই সেতুকে অনেকেই সাড়াঘাটের পুল বা পাকশী ব্রিজ বলেও চিনতো। হতে পারে 'হার্ডিঞ্জ' শব্দটি কঠিন হবার কারণে ইতিহাসের ঐ সহজ সরল পরিচিত নামে একে ভাবতে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো। মূলত: পদ্মার সুস্বাদু ইলিশ আর শাক-শব্জী, মাংস ছিল কলকাতা চালানের মূল পণ্য। এখানে দেশী-বিদেশী বড় বড় ষ্টিমার, লঞ্চ, বার্জ, মহাজনী নৌকা ভিড়তো বন্দরের ১৬টি ঘাটে। প্রায়শই খরস্রোতা পদ্মা গর্ভে লঞ্চ-ষ্টিমার ডুবে প্রাণহানি ও মালামালের ক্ষতি হতো। আর যোগাযোগে গতি বৃদ্ধির বিষয়টি তো ছিলই। এ লক্ষ্যে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসিত ভারত সরকার পদ্মা নদীর উপর রেল সেতুর জন্য প্রস্তাব করে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এই সেতু নির্মানের মঞ্জুরী লাভ করে।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ অবিভক্ত ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ব্রিজটি উদ্বোধন করেন। সেতু তৈরীর সময়কালীন সারা পৃথিবীতে এর ভিত্তির দিক থেকে, এটি ছিল গভীরতম। প্রতিটি স্প্যানের ২টি কুয়ো আর ১৫ নম্বর স্প্যানের কুয়োর গভীরতা ছিল সর্বাধিক, এটি পানির সর্বনিম্ন সীমা থেকে ১৬০ ফিট ও অপরটি ১৫০ ফিট গভীর। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সেতুটি মঞ্জুরী লাভের পর ব্রিটিশ প্রকৌশলী স্যার রবার্ট গেইলস্ হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মাণের প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে ব্রিটিশ সরকার তাকে এই ব্রিজ নির্মাণের স্বীকৃতিসরূপ 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে পদ্মায় সেতু নির্মাণে সার্ভে করা হয়। ১৯১০-১১ তে প্রথম কাজের মৌসুম শুরু হলেও প্রমত্ত পদ্মার ভয়াল স্রোতে এর দুই তীরে সেতু রক্ষা বাঁধ নির্মাণই প্রাধান্য পায়। সেতুটির প্রস্তাবের উপর প্রথম প্রকল্প প্রণয়ন করেন স্যার এস.এম. রেনডলস। শুধু সেতুর নকশা তৈরী করেন প্রধান প্রকৌশলী স্যার উইলিয়াম গেইলস। ঠিকাদার হিসাবে দায়িত্ব পান ব্রেইথওয়াইট এন্ড কির্ক (ব্রিটিশ) প্রতিষ্ঠান। বিখ্যাত ব্রিটিশ স্থপতি আলেকজান্ডার মেয়াডোস রেন্ডেল ব্রিজটির পূর্ণাঙ্গ নকশা প্রণয়ন করেন।

১৯১০-১১ বছরের পুরোটা সময় জুড়ে নদী-রক্ষা বাঁধ নির্মাণের কাজ চলে। দুই পাড়ের উজানে প্রায় ১৫ কিলোমিটার জুড়ে বৃহদাকার পাথর আর মাটি একত্রে মিশিয়ে নদীর দুই পাড়ে ফেলতে থাকেন। রবার্ট উইলিয়াম গেইলস যে পাথর নদীর দু'পাড়ে ফেলেছেন তা দিয়ে আরো কয়েকটি ব্রিজ সেতুটির নির্মাণের প্রধান প্রকৌশলী ব্রিটিশ নাগরিক স্যার রবার্ট উইলিয়াম গেইলসের কোন ছবি সংগ্রহ করা যায়নি, তবে পাকশীতে তার যে একটি বড় বাংলো ছিল, তা এখনও টিকে আছে। বলা হয়ে থাকে, প্রায় এক কিলোমিটার দূরের এই বাংলো থেকে তিনি দূরবীন দিয়ে নির্মাণকাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন।

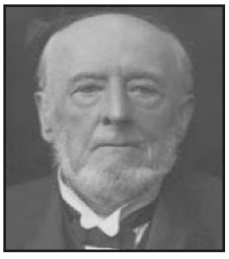

বিখ্যাত ব্রিটিশ স্থপতি আলেকজান্ডর মেয়াডোস রেন্ডেল ব্রিজটির নকশা প্রণয়ন করেন।

তৈরী করা যেত। আর এই মজবুত পদ্ধতি অবলম্বন করার কারণেই ১০০ বছর পেরিয়ে গেলেও সেই বাঁধ এখনও অক্ষত আছে, একটা পাথরও এখনও খসে পড়েনি। সেতুটি নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা তৎকালীন সর্বোচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার করেছিলেন।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় ব্রিজটির মূল অংশের কাজ, ব্রিজটির গাইড ব্যাংক নির্মাণের পাশাপাশি গার্ডার নির্মাণের কাজও। এই

ব্রিজটি এককভাবে বাংলাদেশের বৃহত্তম ইস্পাত নির্মিত ডুয়েল গেজ রেলওয়ে ব্রিজ। ১,৭৯৮.৩২ মিটার বা ৫,৮৯৪ ফুট তথা ১.৮ কিমি ব্রিজটিতে ১৫টি গার্ডার বা স্প্যান রয়েছে যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১২০ মিটার। দু'পাশে রয়েছে আরো ৩টি করে ল্যান্ড স্প্যান। প্রতিটি স্প্যানের ওজন ১,২৫০ টন, রেললাইন সহ ১,৩০০ টন। সেতুটির নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ৩ কোটি ৫১ লাখ ৩২ হাজার ১ শত ৬৪ টাকা (ভারতীয় রূপী)। সেতু নির্মাণ ও রক্ষা বাঁধের জন্য এবং নদী নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন হয় ৫.৪৬ কোটি ঘনফুট মাটির, পাথর ৩.০৮ কোটি ঘনফুট, ইটের গাথুনীর কাজ হয় ২ লাখ ৯৯ হাজার টন, ইস্পাত লাগে ৩০ লাখ টন, আর সিমেন্ট লাগে ১ লাখ ৭০ হাজার ড্রাম ফিল্ড। সেতু তৈরীত মূল স্প্যানের জন্য ব্যয় হয় ১,৮০,৫৪,৭৯৬ টাকা, স্থাপনের জন্য ৫,১০,৮৪৯ টাকা, নদী নিয়ন্ত্রণের জন্য ৯৪,০৮,৩৪৬ টাকা আর দুই পাশের রেল লাইনের জন্য ৭১,৫৫,১৭৩ টাকা। প্রথমে সেতুটির কাজ শুরু হয়েছিল বর্তমান স্থান থেকে ১ কিমি দক্ষিণে। প্রাথমিক কিছু কাজ হবার পর স্থান পরিবর্তন করে এই স্থানে নিয়ে আসা হয়। ২৪ হাজার ৪ শত লোকের দীর্ঘ ৫ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ব্রিজটির উদ্বোধন করেন। প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ব্রিজটির উপর দিয়ে ডাউন লাইনে পরীক্ষামূলক মালগাড়ী চলে ১ জানুয়ারি ১৯১৫-এ। দুই লাইনেই ট্রেন চলাচল করে উদ্বোধনের দিনে ৪ মার্চ, আর যাত্রী নিয়ে নিয়মিত চলাচল শুরু হয় ১ এপ্রিল ১৯১৫ থেকে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর স্বাধীনতা যুদ্ধেও হার্ডিঞ্জ ব্রিজ অংশগ্রহণ করেছিল এবং মারাত্মক আহত হয়ে পঙ্গু হয়েছিল। ঐদিন পাকিস্তানী হানাদারদের যোগাযোগ বন্ধ করতে এবং আটকাতে যুদ্ধের কৌশল হিসাবে মিত্র বাহিনীর বিমানের বোমার আঘাতে ১২ নম্বর স্প্যানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ঝুলে পরে। যুদ্ধের পর ভারতের প্রকৌশলীরা স্প্যান তৈরী করলে তা আগের ডিজাইন মত না হওয়ায় এবং এই সেতু ১০০ বছরের গেরান্টি-ওয়ারেন্টি পিরিয়ডে থাকায় ব্রিটিশ প্রকৌশলীরা বিনা মূল্যেই মূল নক্শা অনুযায়ী পূর্বের আদলে স্প্যান তৈরী করে প্রতিস্থাপন করে দেয়, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে। আর সে বছর ৫ আগস্ট হার্ডিঞ্জ ব্রিজ দিয়ে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হয়। ১২৫০ মেট্রিকটনের ৩৬০ ফিট লম্বা ভাঙ্গা ১২ নম্বর স্প্যানটি মেরামতের সময় পানিতে পরে গেলে তা আর উঠানো সম্ভব হয়নি। তবে ৪০ বছর পর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে পানির স্রোতে ভেসে যাওয়া সেই স্প্যানটি বর্তমান সেতুর তিন কিলোমিটার ভাটিতে জেলেদের জালে আবিষ্কৃত হয় যা আজও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের স্মৃতি বহন করে সেখানে অবস্থান করছে।

"আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে - বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে - - -পদ্মা নদীর আজকের অবস্থার ১০০ বছরেরও আগে, সেই ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ ঐতিহাসিক হার্ডিঞ্জ ব্রিজ উদ্বোধনের সময় সেতুটির প্রধান প্রকৌশলী স্যার রবার্ট গেইলস আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'যে সেতু নির্মাণ করে দিয়ে গেলাম, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে এ সেতু চির যৌবনা হয়ে থাকবে।' কথাটি যে কতখানি সত্য তার প্রমাণ, একশ বছরেও সেতুটির গায়ে বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। তারপরও বয়স ও ভবিষ্যত চিন্তা করে বাংলাদেশ রেলওয়ের উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি এর ব্রিটিশ নির্মাণ ম্যানুয়েল ও ভারতের পুণনির্মাণ ম্যানুয়েল সংগ্রহ করে হিসাব কষছেন মেরামতে অথবা নতুন নির্মাণ - কোনটির স্থায়িত্বকালে এটি সাশ্রয়ী হবে। তাছাড়া এর বার্ধক্যের কারণে এটি ট্রান্স-এশিয়ান রেল করিডোরে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়ার ধকল সইতে পারবে, নাকি, বর্তমান সেতুর উজানে আরেকটি নতুন সেতু তৈরীর প্রয়োজন হবে -তার হিসাব করছেন উচ্চ পর্যায়ের কারিগরি কমিটি॥

Nayanagor Christian Co-operative Credit Union Ltd.

Estd. 1992, Reg. No. 71/98, Ka-47/1, Nadda, Gulshan, Dhaka-1212

Vacancy Announcement

Post - **Junior Officer (Loan Investigation)**

Vacancy : **01**

Job Responsibilities:

- Collect formal information related the matter;
- Verify applicant's present & work address physically;
- Collect information about the loanee & his family members from related sources;
- Prepare an authentic investigation report of the applicant.

Additional Requirments:

* University Graduate;
* Perform any other tasks assigned by the management;
* Have sound knowledge in MS Word & Excel;
* Age limit 25-35 years;
* Candidates who have previous experience will be given priority.

Salary & Other benefits: As per organization policy.

If you are interested and your credentials meet the requirements with the position, then kindly send your resume along with a cover letter & recent photograph to the following address:
President / Secretary, Ka - 47/1, Nadda, Gulshan, Dhaka-1212 or
email us: **ncccul@gmail.com** between **27th July 2023**.

Please inscribe the position on the top of the envelop.

N.B : Only male are allowed to apply. Those who have previously applied for this post need not reapply. The authorities have the power to alter, modify or cancel this notice and personal recommendations will be considered the incompetence of the candidate.

বিজ্ঞ/২২৫/২৩

করোনা রাজার দেশে

মিলটন রোজারিও

করোনা রাজার দেশের রাজ্য সভা। মন্ত্রী পরিষদের সবাইকে নিয়ে রাজা তার রাজ দরবারে বসে আছেন। রাজা মহাশয় করোনা ভাইরাস নিয়ে খুব খুশী। কারণ, তিনি সমস্ত বিশ্বের রাজত্ব করতে চান। আর এই বিশ্বরাজত্ব পাবার উৎসাহদাতা হচ্ছে তার মন্ত্রী মহাশয়। রাজা তাই প্রথমে তার নিজের দেশের খবরাখবর নেয়ার জন্য একটি সভা ডেকেছেন। সেই সভায় রাজ্যের সব শ্রেণির মানুষকে তিনি ডেকেছেন তার রাজ দরবারে। আসুন শুনি আজকের এই রাজসভায় রাজা মহাশয় কি বলেন তার মন্ত্রীপরিষদকে এবং জনগণ রাজাকে। রাজসভার আলাপ আলোচনা "হীরক রাজার দেশে"র আদলে সাজানো হয়েছে।

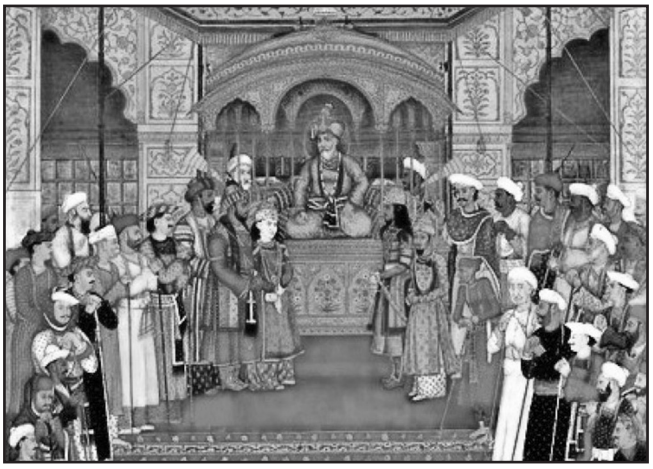

রাজা : হা-হা-হা, কি বুঝলে হে মন্ত্রী মহাশয়?
মন্ত্রী : তা' কি বিষয় আসয়?
রাজা : বাহ্ বাহ্ বাহ্ ! যা নিয়ে সারা বিশ্বে তুলকালাম! তুমি কি কালা নাকি?
মন্ত্রী : সে কথা নয় হুজুর, বলছিলাম কি...
রাজা : তোমার নাকের মাথায় ঘি! কান এতোক্ষণ কোথায় ছিল? দেশের খবরা-খবর কি শুনলে?
মন্ত্রী : নানা চিন্তা মাথায় হুজুর। কোন বিষয়.. তা, ঠিক মত না বল্লে...!
রাজা : যা নিয়ে এত্তো আলোচনা, এত্তো তোলপার সারা বিশ্বে?
মন্ত্রী : এটাই তো চাচ্ছিলেন আপনি অদৃশ্যে...! এতে কার কি আর এসে গেল, মহারাজ!
রাজা : তোমার মাথায় পড়ুক বাজ।
মন্ত্রী : উহু-হু-হু! বাজ পড়লে তো আমি মারা যাবো হুজুর।
রাজা : তুমি মর গে, খেয়ে ঐ বাজারের পঁচা খেঁজুর। শোন, সেই বিজ্ঞানী কই? দেখি না যে তারে!
মন্ত্রী : হুজুর, তিনি করোনা নিয়ে গবেষণা করছেন তার ঘরে।
রাজা : গবেষণা! এখনো সে গবেষণাগারে। তাকে গিয়ে বল, গবেষণা হয়েছে ঢের।
মন্ত্রী : জী হুজুর। সারা বিশ্বের মানুষ এখন পাচ্ছে টের।
রাজা : হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এত্তোক্ষণে তুমি বুঝিয়াছো হে মন্ত্রী মহাশয়। বেশ-বেশ-বেশ।
মন্ত্রী : মহারাজ, বাঁচবে তো আমাদের দেশ?
রাজা : আমাদের দেশ! আমাদের দেশে আবার কি হলো? এখনো ওঠেনি লকডাউন?
মন্ত্রী : মহারাজ, বিজ্ঞানী আছে ঘরে, হচ্ছে না কোন সাউণ্ড।
রাজা : সে কি!? বিজ্ঞানী দিনে ঘুমায় নাকি?
মন্ত্রী : জি আজ্ঞে মহারাজ, তা'হলে আর কই কি!
রাজা : সেনাপতিকে ডাকো। ডাকো আর কে কে আছে ভিতরে এবং বাহিরে।
মন্ত্রী : আপনারা সবাই আসুন ভিতরে। একে একে রাজ দরবারে।
(সেনাপতি, উজির, ডাক্তার, নার্স, রোগী, শিক্ষক-ছাত্র, বাবা, রিক্সাচালক, ভিক্ষুক, সকলের প্রবেশ।)
রাজা : মন্ত্রী মহাশয়, আমার এই রাজ দরবারে, এখনও এতো লোক আসতে সাহস পায়?
মন্ত্রী : জি আজ্ঞে মহারাজ। দেখুন, শুনুন, ওরা কে কি চায়।
রাজা : বিজ্ঞানী কি করোনা বানালো তবে!
মন্ত্রী : মহারাজ, দেশের মানুষ খুব সচেতন এবং বুদ্ধিমান, মানতে হবে। সবাই মুখে মাস্ক পরে হাঁটে। ঘরে গিয়ে হলুদ লেবু আদা চা করে খায়।
(বিজ্ঞানীর প্রবেশ)
বিজ্ঞানী : এতো বুদ্ধি ওরা কোথায় থেকে পায়?
মন্ত্রী : মহাশয়, বিজ্ঞানীর আছে কোথাও গাফিলতি নিশ্চয়।
রাজা : ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাও তুমি এখন তোমার ঘরে। একে একে বলো কার কি অভিযোগ।
মন্ত্রী : এদের কপালে আছে, দুর্ভোগ, দুর্ভোগ, দুর্ভোগ।
উজির : মহারাজ আমি উজির। পেন্নাম হই। আমি কি বলা শুরু করবো?
রাজা : করো, শুনি, কি বলতে চাও তুমি। শুনে করি গর্ব।
উজির : মহারাজ, জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে দাঙ্গা। বন্ধ সব, অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট বাজার, দোকান।
মন্ত্রী : গেছে কি কারো প্রাণ?
সেনাপতি: জী আজ্ঞে মহারাজ! আমরা তাই পালিয়ে এসেছি। এ ছাড়া ছিল না কোন গতি।
রাজা : সেকি, তুমি না সেনাপতি!
সেনাপতি: জি আজ্ঞে মহারাজ। জনগণ সব ক্ষেপে গেছে।
রাজা : জনগণ! এখনও জনগণ বেঁচে আছে? বিজ্ঞানী কই? ডেকে আনো তাকে, এক্ষুনি।
বিজ্ঞানী : জি আজ্ঞে মহারাজ। আমি আছি এখানেই।
রাজা : খেয়ে দেয়ে তো বেশ নাদুস-নুদুস হচ্ছো। কি লাভ হলো, তোমাকে এতো বৎসর পুষে?
বিজ্ঞানী : জি আজ্ঞে মহারাজ, আমি দোষী হলাম কোন দোষে?
রাজা : তোমার ঐ বাদুর-ইঁদুর রাসায়নিক-ফাসায়নিক বিষে কি কিছু হবে?
বিজ্ঞানী : চলছে গবেষণা। আশা করি হবে মহারাজ, হবে।
মন্ত্রী : হবে মহারাজ হবে, কিন্তু কবে?
রাজা : তুমি থামো তো দেখি। বিজ্ঞানী, তোমার এই করোনায় এখনো বাঁচে কি করে মানুষ?
বিজ্ঞানী : মহারাজ, জনগণ খুবই সচেতন। সবাই চলে গেছে লকডাউনে। ঘরে বসে উড়াচ্ছে মনের ফানুস।
রাজা : না-না-না। এই বিজ্ঞানীকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

একে নিয়ে যাও অন্তপুরে, পাতালে।

ডাক্তার : মহারাজ, আমি ডাক্তার। সারাদিন থাকি হাসপাতালে।

রাজা : তা' তোমার কি সংবাদ।

ডাক্তার : মহারাজ, আমরা নই বাদ।

রাজা : আমরা নই বাদ! হেয়ালী করোনাতো। যা বলবে খোলাখুলি বল? আমার হাতে সময় নাই।

ডাক্তার : মহারাজ, ঐ রোগ তো আমাদেরও পিছু ছাড়ছে না। আমরা এখন কোথায় যাই?

রাজা : মন্ত্রী মহাশয় এরা বলছে কি!! কথাটি কি ঠিক?

জনগণ : একদম ঠিক, ঠিক, ঠিক।

রাজা : তোমরা থামো দেখি। তোমরা কি মন্ত্রী নাকি? আমি মন্ত্রীর মুখ থেকে সব শুনতে চাই।

জনগণ : রাজা মহাশয়, কাজটি আপনি ঠিক করেন নাই। আমরা এখন এর বিচার চাই।

মন্ত্রী : আপনারা একটু শান্ত হোন। শান্ত হোন। মনে রাখবেন এটা রাজ দরবার। এতো চেঁচামিচি করে এখানে কথা বলতে নেই।

জনগণ : উমহ। রাজ দরবার। রাজাকে আমাদের সব কথা শুনতে হবে। করোনাকে হঠাতে হবে। আস্তে কথা কেন বলবো?

রিক্সা চালক : মহারাজ। আমরা গরীব মানুষ। রিক্সা না চালালে তো না খেয়ে মারা যাবো।

ভিখেরী : হুজুর।

মন্ত্রী : ঐ ব্যাটা ফহিন্নি, মহারাজাকে হুজুর বলিস কোন সাহসে? মহারাজ বল।

ভিখেরী : ক্ষেমা চাই। মহারাজ। রাস্তা ঘাটে কোন লোকজন নাই। আমরা খাওনও পাই না। তাই শরীর ভীষণ দুর্বল।

মন্ত্রী : উহ:, শরীর দুর্বল। তোরা মরতে পারিস না।

শিক্ষক : মন্ত্রী মহাশয় মুখ সামলে কথা বলবেন। ওরাও মানুষ। আপনি ওদের সাথে এইভাবে কথা বলতে পারেন না।

রাজা : খামোশ সবাই, খামোশ। আপনি তো শিক্ষক মশাই। বলেন কি আপনার অভিযোগ।

মন্ত্রী : অভিযোগ নয় মহারাজ। সামনে আছে দুর্যোগ, দুর্যোগ, দুর্যোগ।

শিক্ষক : জি আজ্ঞে মহারাজ। আপনার এই করোনার ভয়ে সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। অফিস আদালত, সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড, মহারাজ।

রাজা : আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না তো পণ্ডিত। পড়াশোনা ঢের হয়েছে। তুমি গিয়ে করো অন্য কাজ।

ছাত্র : মহারাজ। আমি একজন ভার্সিটির ছাত্র। আপনার সাথে নাই আমাদের কোন দ্বন্দ্ব।

রাজা : হ্যাঁ। অনেক বেশি শেখা হয়ে গেছে তোমাদের। এখন থেকে লেখাপড়া সব বন্ধ।

ছাত্র : এটা ঠিক নয় মহারাজ। আমরা দেশের ভবিষ্যৎ। আমাদের লেখাপড়া বন্ধ হলে দেশে আগুন জ্বলবে।

রাজা : মন্ত্রী মহাশয়, এ ছাত্র আগুন জ্বালাতে চায়! আপনি শুনুন ও আর কি বলবে।

মন্ত্রী : বাবা ছাত্র। তুমি পণ্ডিত হতে চাও কেন? বেশি শেখা জানা তো ভালো না।

ছাত্র : দেখুন মহারাজ। আমাদের খেপাবেন না। ধ্বংস করুন আপনার এই মরণব্যাধি করোনা।

মন্ত্রী : হুজুর শুনুন, শুনুন কি বলছে এই ছাত্র।

বাবা : ছাত্র ঠিকই বলছে মন্ত্রী মহাশয়। দেশের সবাই ক্ষেপে গেলে থাকবে না ঘাড়ে মুণ্ড। এটাই বলতে চাই মাত্র। মহারাজা, আমি ছাত্রের পিতা। আমাদের অফিস আদালত, কলকারখানা সব বন্ধ।

মন্ত্রী : থাক হয়ে অন্ধ।

রাজা : মন্ত্রী মহাশয় এবার তুমি থামো। জ্বলদি তৈয়ার কর আমার হেলিকপ্টার। অবস্থা বেশি সুবিধার নয়।

জনগণ : মহারাজা কি পেয়েছেন ভয়!

রাজা : না-না-না! ভয় পাবো কেন! ভয় পাবো কেন! হা-হা-হা আপনারা তো সব আমার দেশের লোক, আপন জন।

শিক্ষক : মহারাজ এই দেখুন, আপনার বিজ্ঞানীকে ধরে এনেছে জনগণ। তার হাতে হেলিকপ্টারের বল্টু।

রাজা : তুমি না বিজ্ঞানী। তোমার এত্তো সাহস! নাম তো তোমার, পল্টু।

মন্ত্রী : হুজুর, আমি একটু ওয়াশরুম থেকে আসি।

জনগণ : ধর মন্ত্রীকে ধর। দেবো ওকে ধরে ফাঁসি।

রাজা : হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন আপনারা। ঠিক বলেছেন। ঐ ব্যাটাকে ধর। ঐ হলো আসল শয়তান এবং দোষী। দাও ওকে ধরে ফাঁসি।

জনগণ : বিজ্ঞানী এবার তোমারও মুক্তি নাই। ধ্বংস কর তোমার বানানো ঐ মরণব্যাধি করোনা। নইলে আমরা সবাই কিন্তু আছি। তোমাকেও দেব ফাঁসি

বিজ্ঞানী : ভাইসব আমিও তোমাদের দলে আছি। ঐ মন্ত্রী মহাশয় এসবের নাটের গুরু।

জনগণ : ধর ব্যাটা মন্ত্রীকে। রাম ধোলাই কর শুরু। ধ্বংস কর করোনা রাজার দেশ, গড়ে তোল করোনা মুক্ত সোনার বাংলাদেশ॥

বাড়ী-ভাড়া

১০/ই, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও কলেজের গলিতে পঞ্চম তলায়, ১ বেড রুম, ডাইনিং, বারান্দা, বাথরুম + কিচেন সহ, খালি ফ্ল্যাট, ভাড়া দেয়া হবে। আগ্রহী ব্যক্তিদের আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নে দেয়া মোবাইল নম্বর এ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

১। ০১৫৫২-৪৪২ ৭৫০, ২। ০১৭৬৫-৫৮৬ ৩১৮

বিজ্ঞ/২২৮/২৩

সাহায্যের জন্য আবেদন

আমি অনুপ থিউফিল গমেজ গ্রাম: করান, পো: নাগরী, থানা: কালীগঞ্জ, গাজীপুর, ধর্মপল্লী: নাগরী। আমি রাজমিস্ত্রির একজন হেলপার। পরিবারে আমিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এখন আমি গুরুতর অসুস্থ। আমার কিডনীতে পাথর এবং স্বাভাবিকের তুলনায় কিডনী অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসার জন্য দুই লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন যা যোগার করা আমার সামর্থের বাইরে।

সমাজের বিত্তবান ও সুহৃদয়বান ব্যক্তিবর্গের কাছে আমার চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করছি।

অনুপ থিউফিল গমেজ **ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ**

বিকাশ নাম্বার : ০১৭২০৬২৫৭৪১ **নাগরী ধর্মপল্লী**

বাংলার জনপদ থেকে

সিনোডাল চার্চ ও চার্চের প্রতিষ্ঠান

ফাদার সুনীল রোজারিও

গত দেড় বছরের অধিক সময় ধরে মণ্ডলীতে সিনোডাল চার্চ নিয়ে আলোচনা চলে আসছে। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৯-১০ অক্টোবর রোম নগরীতে বিশপীয় ধর্মসভার প্রস্তুতি যাত্রা শুরু হয়েছিলো। সেই থেকে শুরু। সিনোডাল চার্চের প্রথম অধিবেশন বসবে আসছে অক্টোবর মাসে এবং দ্বিতীয় অধিবেশন হবে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। দীর্ঘ সময় ধরে ক্যাথলিক চার্চের শতকোটি মানুষ, খ্রিস্টভক্তের দায়িত্ব- তথা মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ নিয়ে স্থানীয়ভাবে সভা সেমিনার করছেন, উদ্যোক্তা ও আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করছেন। সময় নিয়ে চলার কারণে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, চলার পথে আমরা সহযাত্রী- সবাইকে হতে হবে সবার তরে। বিষয়টির প্রেক্ষিতে আজকে দেখতে চাই- কাথলিক চার্চের যে সব অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান রয়েছে সিনোডাল চার্চের যাত্রাপথে সেগুলোর মধ্যে কতোটুকু সংস্কার এসেছে- অবদান কোথায় এবং কতোটুকু।

সিনোডাল চার্চের কার্যকর দলিলে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর Vatican synodality text calls for structural reforms শিরোনামে বলা হয়েছিলো Church's global synod on synodality has called for institutional and structural reform of the Church at all levels, অর্থাৎ গোটা বিশ্বব্যাপী চার্চের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন- যেনো খ্রিস্টসমাজের জীবনের সঙ্গে সবকিছু একীভূত হতে পারে। কিন্তু কার্যকর দলিলে নির্দিষ্ট কোনো অভিমত দেয়নি যে, চার্চের প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোর কোন কোন জায়গায় সংস্কার প্রয়োজন। দলিলে অভিমত না দেওয়ার পিছনে বড় কারণ ছিলো ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতা, সংস্কৃতি ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী।

বাংলাদেশে কাথলিক চার্চ পরিচালিত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম- বেসরকারি সাহায্য সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান। চার্চের সংস্কারীয় পালকীয় সেবা ভক্ত পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকলেও উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ড মেঠোপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যারা সেবা লাভ করছেন তাদের বেশির ভাগ অ-খ্রিস্টান ভাই-বোন। সিনোডাল চার্চের যে মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে- সেই প্রেক্ষিতে আমরা অ-খ্রিস্টান ভাই-বোনদের কতোটুকু আমাদের সম্পর্কে বলতে পেরেছি? মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে হয়ে উঠতে হবে জনগণের অংশগ্রহণমূলক অবকাঠামো, যাত্রাপথে একটি সমন্বিত আহ্বান। চার্চ সূর্যের আলো নাও হতে পারে কিন্তু একটি মাটির প্রদীপ তো হতে পারে। যিশু বলেছেন, "মানুষের সামনে তোমাদের আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলুক, যাতে তোমাদের সৎকর্ম দেখে সকলেই তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে" (*মথি ৫:১৬*)।

মানুষের কাছে এমনিতেই যাওয়া যায়না- যথার্থ কিছু এ্যাজেণ্ডা থাকতে হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোই চার্চের এ্যাজেণ্ডা। সাহায্য সংস্থার মধ্যে কর্মরত এবং যারা বেনেফিসিয়ারি তাদের সংখ্যা কতো? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একই চিত্র। এগুলোর মধ্যদিয়ে ঈশ্বর আমাদের কতো বড় সুযোগ করে দিয়েছেন মানুষের সর্বত্র যাবার জন্য। যিশু বলেছেন, "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও, বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা করো মঙ্গলসমাচার" (*মার্ক ১৬:১৫*)। এছাড়াও গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে আছে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান। এই স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর দুর্গম এলাকার মানুষের রয়েছে বড় আস্থা। প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তারা সেবা পেয়েই সন্তুষ্ট- নাকি আমরা তাদের কাছে আমাদের মূল্যবোধ তুলে ধরতে পেরেছি? আমরা কী শুধু খ্রিস্টীয় সমাজের জন্য? যিশু শিষ্যদের বলেছেন, "যারা তোমাদের ভালোবাসে শুধু তাদেরই যদি ভালোবাসো, তবে তোমরা কী পুরস্কারই বা আশা করতে পারো?" (*মথি৫:৪৬*)। সিনোডাল চার্চের কার্যকর দলিলে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে, The ultimate purpose of the synodal process, "is not to produce documents but to open horizons of hope for the fulfillment of the Church's mission." অর্থাৎ সিনোডালের যে মৌলিক উদ্দেশ্য সেটা দলিলপত্র তৈরি বা প্রকাশনা নয় কিন্তু চার্চের মিশন যেনো পূর্ণতা পায় তার জন্য আশার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করা। সিনোডাল চার্চ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় একটা বড় সুযোগ ছিলো আশার নতুন দিগন্ত তৈরি করার। কিন্তু বাস্তবে চোখে পড়ার মতো আশার তেমন ফ্রন্টিয়ার খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সিনোডাল চার্চের আলোকে ও যাত্রাপথে দিকনির্দেশনা আরও সৃজনশীল হওয়া উচিত। চার্চ তার প্রশাসনিক অবকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে এতো বেশি ব্যস্ত না থেকে আশার নতুন দিগন্ত খোলার আয়োজন করতে পারতো। হতে পারে সংখ্যালঘু হিসেবে একটা ভয় আমাদের মধ্যে কাজ করছে। কিন্তু ইতিহাস কী বলে? এই বিশাল ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কতোজন এসেছিলেন খ্রিস্টের বাণী প্রচার করার জন্য? ঈশ্বর তাঁর ভক্তগণের আশ্রয় নিশ্চিত করে বলেছেন, "সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ- আমি কাকে ভয় করবো? সদাপ্রভু আমার জীবন-দুর্গ- আমি কাকে ভয় করবো" (*সাম ২৭:১*)।

সিনোডাল চার্চ সামনে রেখে চার্চের হাতে সময় ছিলো প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছু সংস্কার সাধন করা। হয়ে থাকলেও চোখে পড়ছে না। কার্যকর দলিল এটাকে বলেছে, Reform of all ecclesiastical structures. অন্য কথায় ভক্ত সমাজ যে অবকাঠামোর মধ্যে অবস্থান করছে- সে সব জায়গায় সংস্কার সাধন। দলিল জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করছে যে, "All Church institutions, as fully participatory bodies, are called to consider how they might integrate the call to synodality into the ways in which they exercise their functions and their mission, renewing their structures and procedures" ও যার মূল বার্তা হলো, মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানগুলো অংশগ্রহণমূলক অঙ্গ হিসেবে আহ্বান করা হয়েছে যেনো কাজকর্ম, প্রেরণের নিমিত্তে অবকাঠামোর পুনর্বিন্যাস ও পরিচালনায় সমন্বয় সাধন করতে পারে। দলিলে কাঠামোগত সংস্কারের কথা বলা হলেও এটাই মূখ্য নয়, "there is a need for ongoing formation to support a widespread synodal culture, the need for more specific formation in listening and dialogue" তার মানে বিস্তৃতভাবে সিনোডাল সংস্কৃতিকে সমর্থন দেওয়ার জন্য চলমান গঠনপ্রণালী প্রয়োজন, সেই সঙ্গে প্রয়োজন শ্রবণ এবং সংলাপ, থাকতে হবে সিনোড প্রতিনিধিত্বকারি ও কর্মীদল।

উপসংহারে বলতে চাই- সিনোডাল মণ্ডলীর এই যাত্রা শেষ হবার নয়। এই যাত্রা আগামীদিনেও মণ্ডলীর পালকীয় জীবনের সর্বস্তরে বিরাজমান থাকবে। তাই আজকের সিনোডাল চার্চের যাত্রায় ভাবতে হবে- আজ না হোক, ভবিষ্যতকাল ধরে চার্চের প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে একটি সমন্বিত সেবার কৃষ্টি যেনো গড়ে তোলা সম্ভব হয়। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা॥

মা-বাবার বিরুদ্ধে সন্তানদের অভিযোগ

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

বিজয় ও তাপসির একটি সাধারণ পরিবার। পরিকল্পনাবিহীনভাবে ইতোমধ্যে অনেক সন্তানের জন্ম হয়েছে। পরিবার বড় হওয়ার আর্থিক দৈন্যদশা পিছু ছাড়ছে না। নুন আনতে পান্তা শেষ। অভাবের সংসারে ছেলেমেয়েদের সুখের জন্য অহর্নিশী পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এ অবস্থায়ও ছেলে-মেয়েদের চাহিদার কোন শেষ নাই। আধুনিকতার স্পর্শে বড় ছেলে-মেয়েদের নিত্য-নতুন চাহিদায় বাবা-মা অতিষ্ট। দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে মানসিকভাবে তারা ভেঙ্গে পড়ছে।

অপর দিকে ছোট ছেলে-মেয়েদের স্বাভাবিক নিয়মে একটু বেশি আদর, সোহাগ, স্নেহ-ভালোবাসা, প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে একটু বেশি নজর দিতে হচ্ছে। কারণ তারা যেমন অসহায় তেমন সহজাত প্রবৃত্তিতে দুর্বল বৈশিষ্ট্যের। এ নজরদারী বড় ছেলে-মেয়েরা সহ্য করতে পারছে না। এ অবস্থায় মা-বাবার একতরফা বা পক্ষপাতিত্ব ভালোবাসা সহ্য করতে না পেরে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করালো।

বড় সন্তানেরা মাকে জানিয়ে ছিল যে, বাবা বাড়িতে ফিরে আসলে যেন আর কোথাও না যায়। আজ তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে উপস্থিত রেখে আমাদের কিছু কথা বার্তার ইচ্ছা প্রকাশ করছি। যেমন কথা তেমন কাজ। সন্ধ্যায় মা-বাবার সাথে বড় ছেলে-মেয়েদের সংলাপ শুরু হলো। তাদের মা-বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো তুলে ধরল:

১। অনেকদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করছি যে, আপনারা আমাদের ছোট ভাই-বোনদের একটু বেশি স্নেহ-মায়া-মমতা, আদর-ভালোবাসা দিয়ে আমাদের বরং বঞ্চিত করা হচ্ছে।

২। খাদ্য, বস্ত্র সব কিছুতে আলাদাভাবে তারা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে যা আমাদের কাছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও অশান্তির কারণ। এ ব্যাপারে বাবা-মা তোমাদের কাছ থেকে স্পষ্ট উত্তর আমরা আশা করছি।

একপর্যায়ে মা বড়ছেলে ও মেয়েকে লক্ষ্য করে বলতে শুরু করলেন- দেখ, তোদের বাবা কত কষ্ট করে যে আয় উপার্জন করে তা তোদের জন্য ব্যয় করছে এবং সাধ্য মত সুখে রাখতে সর্বদা কষ্ট করছে। আর এমনিতেই কঠোর পরিশ্রমে নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগ করে নিজের স্বাস্থ্যের ক্রমান্বয়ে অবনতি হচ্ছে তোদের চোখের সামনেই। তদ্রুপ বাবা সন্তানদের তাদের মা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দেখতো তোদের মায়ের চেহারা দিন দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে তোদের প্রতি সেবা-যত্ন, খানা-পিনার ব্যবস্থা করতে গিয়ে। তাছাড়া বড় ছেলে-মেয়ে যারা তোরাও একসময় যখন ছোট ছিলে, তোদের সেবা-যত্নে কখনো আমরা অবহেলা করিনি, পারত পক্ষে কোন কিছুর কমতি রাখিনি। আজ তোরা বড় হয়েছিস। তোদের নিজেদের যত্ন নিজেরাই রাখতে সক্ষম। আর ছোট যারা তারা যেমন অসহায়, অক্ষম, দুর্বল তাদের প্রতি সেবা যত্ন একটু বেশিই প্রয়োজন। ছোট ভাই-বোনদের জন্য আমরা যা কিছু করছি তাতে আমরা যদি কোন ভুল করে থাকি তার যে শাস্তি আমাদের দিতে চাস ও যে অভিযোগ সে বিষয়ে তোদের যা করণীয় তা-ই কর।

তবে আবার বলি, তোদের কল্যাণের, মঙ্গলের জন্য মা-বাবা হয়েও কত দিন অনাহারে, মঙ্গলের জন্য মা-বাবা হয়েও কত দিন কাটিয়েছি। পরনের একটার বেশি দু'টা জামা কাপড় ব্যবহার করিনি। বরং তোদের দিকে তাকিয়ে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে গিয়ে তোদের জন্যই সব কিছু ত্যাগ করে তোদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাদের আরাম আয়েশ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছি। আমরা মা-বাবা বিবাহিত জীবনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যে সন্তান আমরা লাভ করব, তাদের একজনও যেন কোন প্রকার অবহেলার স্বীকার না হয় এবং আদর্শ নীতি নিয়ে ধার্মিকতার সাথে তাদের বেড়ে উঠতে ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গঠনে দ্বিধাবোধ না করি। সততা ও মূল্যবোধ নিয়ে ভালোবাসায় তোদের আগলিয়ে রাখতে পারি।

সবকিছু মা-বাবার মুখে শুনতে পেরে বড় ছেলে-মেয়ে দুঃখ পেয়ে তাদের কাছে ক্ষমা ও অনুতপ্ত হয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। তারা তখন থেকে উপলব্ধি করল সত্যিকারে বাবা-মা আত্মত্যাগ, ভালোবাসা, স্নেহ-মায়া মমতা কষ্ট-দুঃখ অকাতরে সন্তানদের দান করেন এবং তাদেরকে ঘিরেই রচনা করতে চান স্বর্গীয় সুখ, আনন্দ ও অনাবিল শান্তি॥

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
৫ম শ্রেণি
হলি ক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

আমার কথা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

বিপন্ন বিস্ময় দগ্ধ করে আমাকে
আমি পরাবাস্তবতার কথা ভুলে
যত অতীত বর্তমান রেখেছি তুলে
কাগজে মুড়ে ভবিষ্যতের তাকে।

যখন সময় হবে আগামীতেও কখনো
নিজেকে আলগা করে একেবারে
মানুষের সামনে যেয়ে বলব, শোন,
যা আছে দুঃখ ব্যর্থতা ঝেড়ে একেবারে
দেখ তোমরা এখন সামনের দিকে
কী দেখা যায়? যদি দৃষ্টি হয় ফিকে
সমস্যা নেই অনুভবের উঠানে
দাঁড়িয়ে বাতাসের গতি বোঝ
তার মাঝে তোমরা নিজেদের খোঁজো
দেখ আমাকে পেয়েছি আমি জীবনের উজানে॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পোপ ফ্রান্সিস যুব পোলিশ তীর্থযাত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন

১৫০ জন যুব তীর্থযাত্রী কয়েকটি পরিবারসহ গত সোমবার (১৭/৭) সকালে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পোলাণ্ডের বৃহত্তম চার্চ ম্যুভমেন্ট 'ওয়েসিস অব দ্য লিভিং চার্চ' (Oasis of the Living Church) এর আদলে আলো ও জীবন কমিউনিটির (Light and Life) নির্জনে অংশ নিতে গত ১৫ জুলাই সকলে রোমে এসে পৌছে। লুদজ এর আর্চবিশপ কার্ডিনাল-মনোনীত গ্রেগোরজ রিজ নির্জনধ্যান পরিচালনা করেন। এই তরুণ-তরুণী ও পরিবারগুলো সারাবছরব্যাপী তাদের ধর্মপল্লীগুলোতে খ্রিস্টিয় গঠন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। রোমে তাদের তীর্থযাত্রা প্রকাশ করে নির্জন ধ্যানের গভীরতায় তাদের প্রবেশ যা তাদেরকে পোলাণ্ডের বিভিন্ন অংশ থেকে এক করে। 'ওয়েসিস অব দ্য লিভিং চার্চ' ম্যুভমেন্টটির মধ্যদিয়ে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিটিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফাদার ফ্রান্সিজেজ ব্লাসনিকি।

লিসবনে বিশ্ব যুব দিবসের জন্য হংকং এর তীর্থযাত্রীরা প্রস্তুত

বিশ্ব যুব দিবসে অংশগ্রহণনেচ্ছু হংকং এর ৩০০ যুবককে কার্ডিনাল-মনোনীত স্টিফেন চাও-ইয়ান এসজে বিশেষ 'মিশনারী ম্যাণ্ডেড' প্রদান করেছেন। সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত যুবদের নিয়ে এই আন্তর্জাতিক সমাবেশ শুরু হতে যাচ্ছে ১ আগস্ট থেকে পর্তুগালের লিসবনে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২ আগস্ট থেকে সেখানে পৌঁছবেন এবং ৬ আগস্ট পর্যন্ত থাকবেন। হংকং এর যুবকেরা বিভিন্ন ধর্মপল্লী, ধর্মীয় সংঘ, স্কুল ও মাণ্ডলিক সমাজ হিসেবে ১৪ দলে ভাগ হয়ে সেখানে অংশগ্রহণ করবেন। প্রত্যেক দলকেই একজন যুবক পরিচালনা করবেন এবং বিশ্ব যুব দিবসে দলকে সহায়তা করবে। ইতোমধ্যে ১৪জন দলনেতা গঠন প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং ৪টি সভাতে অংশগ্রহণ করেছে। এ সময় তারা মঙ্গলসমাচার সহভাগিতা, খ্রিস্টপ্রসাদীয় আরাধনা এবং সংঘবদ্ধ প্রার্থনা অনুশীলন করেছে।

মিলন একতায় বিশ্বাস সহভাগিতা: 'মিশনারী ম্যাণ্ডেড' প্রদানের জন্য সম্প্রীতি কার্ডিনাল-মনোনীত হংকং এর অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার ক্যাথিড্রালে খ্রিস্টযাগ করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে হংকং এর বিশপ যুবকদেরকে আহ্বান করেন উন্মুক্ত হৃদয়ে বিশ্ব যুব দিবসে অংশগ্রহণ করতে। তিনি আরো বলেন, পোপ ফ্রান্সিস তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তিনি তোমাদের পরামর্শ দিয়েছেন যেন তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে বের হয়ে প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিতে পারো সাড়া বিশ্ব থেকে আগত যুবকদের সাথে পারস্পরিক সাক্ষাৎকারে ও সম্পৃক্ততা আনয়ন করে। তিনি উদাত্ত আহ্বান করেন যেন যুবকেরা মিলন একতায় লিসবনে আগত অন্য যুবকদের সাথে বিশ্বাস সহভাগিতা করে।

ইউরোপ জুড়ে তীর্থযাত্রা: খ্রিস্টযাগের উপাসনায় ১৪জন দলনেতাকে বেদীতে আহ্বান করা হয় যাতে করে তারা ধন্যা কুমারী মারীয়ার আশ্রয় যাঞ্চা ও প্রার্থনা করে তাদের জীবনে প্রভুর ইচ্ছাকে জেনে নম্রভাবে তা অনুসরণ করতে পারে। ধর্মপ্রদেশীয় যুব কার্যক্রমের প্রেসিডেন্ট ফাদার ফ্রুকটুজো লপেজ মার্টিন আরো কয়েকজন যাজকদের সহায়তায় হংকং এর ৩০০ জনের দলকে পরিচালনা করবেন। লিসবনে পৌছানোর পর যুবকেরা আধ্যাত্মিক নির্জনধ্যানে অংশগ্রহণ করবে এবং বেশ কয়েকটি গঠন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে যুবদিবসে আগত পোপ মহোদয় ও ৬ লক্ষ যুবকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে। তাদের ভ্রমণসূচী অনুযায়ী যুব তীর্থযাত্রী দলটি সাধু জেমসের (কামিনো দি সান্তিয়াগো) বিখ্যাত পথ ধরে ১০০ কিলোমিটার যাত্রা শুরু করবে, যা স্পেনের সান্তিয়াগো দে কম্পোস্তেলা যাবার একটি অংশ অতিক্রম করবে। ইউরোপ অবস্থানকালে তারা ফ্রান্স এবং জার্মানীর এসন ডায়োসিসের বিভিন্ন ধর্মপীঠগুলো পরিদর্শন করবে।

মিশনারী মা: ২০২৩ যুবদিবস যুবকদেরকে 'মারীয়া ওঠলেন ও তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করলেন' এ মটো থেকে পরিচালনা নিতে আহ্বান করছে। প্রত্যেকজন যুব তীর্থযাত্রী সাক্ষাৎকারের মারীয়াকে তাদের অনুপ্রেরণা হিসেবে নিতে পারেন, যিনি দূতের মুখে ঈশ্বর জননী হবার সংবাদ পাবার পরপরই তাঁর জ্ঞাতিবোন এলিজাবেথের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন।

প্রার্থনা ও অন্বেষণ

তিনধাপের নির্জনে রোমে তীর্থ এবং পোপের সাথে সাক্ষাৎকারের ঘটনাটিই যুবক ও পরিবারগুলোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। অংশগ্রহণকারীদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে যেন তারা বিভিন্নতার মধ্যে মণ্ডলীর রহস্য অনুধাবন করতে পারে এবং বিশ্বাসী সমাজে তাদের পথ খুঁজে বের করে। নির্জনধ্যানকারীগণ প্রার্থনার বিভিন্ন ধরণ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পেরেছে, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছে এবং খ্রিস্টীয় ইতিহাসের গভীরতা আবিষ্কার এবং বিভিন্ন ধর্মপীঠে পরিদর্শন করেছে।

'বিশ্বাসের সাক্ষীদাতা:নতুন ধর্মশহীদদের কমিশন' প্রতিষ্ঠা করেন পোপ ফ্রান্সিস

২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুবিলীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে গত ৫ জুলাই পোপ ফ্রান্সিস একটি পত্র প্রকাশ করেন যেখানে তিনি 'বিশ্বাসের সাক্ষীদাতা: নতুন ধর্মশহীদদের কমিশন' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দান করেন। যা ডিকাস্টারি ফর দ্য কজ অব সেইন্টস্ এর সাথে সংযুক্ত থাকবে। এই বিশেষ কাজে জড়িত দলটি বিগত ২৫ বছরে যারা খ্রিস্টকে স্বীকার করে এবং মঙ্গলবার্তার সাক্ষ্য বহন করে রক্ত ঝরিয়েছে তাদের নামের তালিকা তৈরি করবে। পোপ মহোদয় পত্রে লিখেন; মণ্ডলীতে ধর্মশহীদেরা আশার সাক্ষ্যদাতা যা খ্রিস্ট যিশুর প্রতি বিশ্বাস থেকে আসে এবং সত্যিকার দয়াতে উদ্দীপ্ত করে। আশা এ গভীর প্রত্যয় সঞ্চার করে যে, ভালো মন্দতা থেকে শক্তিশালী। তাইতো ঈশ্বর খ্রিস্টেতে পাপ ও মৃত্যুকে জয় করেছেন।

যুগে যুগেই খ্রিস্টশহীদেরা তাদের বিশ্বস্ততার প্রকাশ ঘটিয়ে গেছেন। ১ম শতাব্দী থেকে বর্তমান সময়ে খ্রিস্টশহীদের সংখ্যা আরো বেশি। করে। এই দলটি তৈরি করার সিদ্ধান্তটি শুধুমাত্র ঈশ্বরের মহান কাজের কারণে হারানো অজানা সৈনিকদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা যা সাধু পোপ ২য় জন পল তাঁর সার্বজনীন পত্র তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রাক্কালের মধ্যদিয়ে ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তবে পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, দলের গবেষণা কেবল শুধুমাত্র কাথলিক খ্রিস্টমণ্ডলীর শহীদদের জন্যই নয়, সমস্ত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্যই তা প্রসারিত হবে। কেননা দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে আমরা সকলেই প্রেরণদায়িত্ব পেয়েছি॥

- ছবি : news.va

আহ্বান সেমিনার

গত ০৪ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ মঙ্গলবার গৌরনদী ধর্মপল্লীতে "এসো আমার অনুসরণ কর" মূলভাবের উপর ভিত্তি করে বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী কমিশনের আয়োজনে গৌরনদী ও ঘোড়ারপার ধর্মপল্লীর সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যৌথ ভাবে আহ্বান সেমিনার করা হয়। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ফাদার, সিস্টার এবং ব্রাদারগণ সহ মোট ১০৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সকাল ৯.১৫ মিনিটে প্রারম্ভিক প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেমিনার শুরু করা হয়। উপস্থিত সকলের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, পাল-পুরোহিত গৌরনদী ধর্মপল্লী। এরপর মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ব্রাদার শিমুল সিএসসি। বরিশাল ডাইওসিসে সেবাদানরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ইতিহাস, প্রৈরিতিক সেবা কাজ ও জীবন সম্পর্কে সহভাগিতা করেন ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ।

এরপর কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং উপদেশ বাণী রাখেন ফাদার রবার্ট দিলীপ গমেজ, সিএসসি। পরিশেষে যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার মুকুল আন্তনী মণ্ডল উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আহ্বান সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজের হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন ও লগো উন্মোচন

লর্ড রোজারিও ২৪ জুন রোজ শনিবার সেন্ট যোসেফস স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হীরক জয়ন্তীর লগো উন্মোচন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বনপাড়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও গভর্নিং বডির সভাপতি ফাদার দিলীপ এস কস্তা, অধ্যক্ষ ফাদার ডক্টর শংকর ডমিনিক গমেজ, ফাদার পিউস গমেজ সহ বিদ্যালয়ের সকল সম্মানিত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অধ্যক্ষ মহোদয় তার শুভেচ্ছা বাণীতে বলেন, সেন্ট যোসেফস্ স্কুলের ৬০ বছরের পূর্তি পালন করতে পারা আমাদের জন্য আনন্দের ও গর্বের।

ফাদার দিলীপ এস কস্তা তার বক্তব্যে জুবিলীর তাৎপর্য ও সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, জুবিলী হলো অনুপ্রেরণার এবং নবায়ন করে আরো সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া।

পরে ফিতা কেটে জুবিলী ফলক উন্মোচন করা হয়। জুবিলীর লগোর ব্যাখা করে ফাদার পিউস গমেজ বলেন, লোগোতে ব্যবহৃত ৬০ হীরক জয়ন্তীর নির্দিষ্ট সময়কে প্রকাশ করে। এর সাথে সংযুক্ত প্রদীপ্ত শিখা শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার চলমান ধারাকে তুলে ধরে। ব্যবহৃত মনোগ্রাম প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় চিহ্ন ।উপরে নিচে থাকা দুটো হাত সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজের মূলমন্ত্র বা মটো (MOTO) শিখ ও সেবা কর এর অর্থকে প্রতিবিম্বিত করে।

স্কাউট ডে ক্যাম্প

গত ২৬ জুন বনপাড়া সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল স্কাউট ডে ক্যাম্প। সকাল ৮:৩০ মিনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, অতিথিদের বরণ ও শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি ফাদার দিলীপ এস কস্তা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ ডক্টর ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ, ফাদার পিউস গমেজ, মহিউদ্দিন স্যার, দীপংকর এক্কা ও স্কাউট ক্যাম্পে অংশগ্রহনকারী ছাত্র- ছাত্রী।

ফাদার দিলীপ এস কস্তা তার বক্তব্য বলেন, স্কাউট হলো অন্যের সেবায় নিয়োজিত। যারা স্কাউট করে তারা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সকলের আগে এগিয়ে আসে। আজকের দিনের কর্মসূচী সুন্দর হোক এই কামনা করি। অধ্যক্ষ মহোদয় তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে রাখেন। এরপর বক্তব্য রাখেন ফাদার পিউস গমেজ।

পরে স্কাউটের সদস্যদের স্কাউট সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে ধারণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নাটোর জেলার স্কাউট প্রশিক্ষকগণ এবং তাদের সহায়তা দান করেন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক। দিনের কর্মসূচিতে ছিল হাইকিং যা স্কাউটিং এর আউটিং কার্যক্রমের অন্যতম। যার মাধ্যমে স্কাউটের সদস্যরা বনপাড়া ধর্মপল্লীতে পরিভ্রমণের মধ্যদিয়ে রাস্তার মানচিত্র ও ভ্রমণ সম্পর্কিত রিপোর্ট দলনেতার কাছে উপস্থাপন করে।

পরিশেষে বিকাল ৫ টায় আনন্দ বিনোদন ও সার্টিফিকেট বিতরণের মধ্যদিয়ে সমাপ্তি ঘটে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত স্কাউট ডে ক্যাম্প॥

লেখালেখির কৌশল ও মঙ্গলবাণী প্রকাশে তা প্রয়োগ

জিদান ত্রিপুরা ▯ গত ৮ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার সকাল ৯ টায় সেন্ট যোসেফ সেমিনারীতে ম্যাথিস হাউজ ও রমনার সেমিনারীয়ানদের নিয়ে "লেখালেখির কৌশল ও মঙ্গলবাণী প্রকাশে তা প্রয়োগ" বিষয়ক যোগাযোগ ও মিডিয়া সেমিনারের আয়োজন করে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশন। রমনা সেমিনারীর সেমিনারীয়ানদের প্রার্থনা পরিচালনা ও সঞ্চালনার মধ্যদিয়ে শুরু হয় সেমিনার। সেমিনারের শুরুতে যোগাযোগ কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু সেমিনারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করে বলেন, লেখালেখি করাটাও একটি সেবাকাজ। তাই লেখালেখির কৌশল জানলে সেমিনারীয়ানরা এখন ও ভবিষ্যতে বাণী প্রচারে আরো বেশি ফলপ্রসূভাবে তা প্রয়োগ করতে পারবে। পরে ম্যাথিস হাউজ ও রমনা সেমিনারীর পরিচালকগণ তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

১ম উপস্থাপনায় ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি যোগাযোগ ও মিডিয়া বিষয়ক মণ্ডলীর ভাবনা তুলে ধরেন। উত্তম যোগাযোগের কেন্দ্রে মানুষকে রেখে মিডিয়াকে যথার্থভাবে ব্যবহার করতে হবে যোগাযোগ সম্পর্ক উন্নয়ন করার জন্য। ২য় উপস্থাপনায় রবীন ভাবুক লেখালেখির কৌশল, রিপোর্ট, ফিচার, সাক্ষাৎকার ও গল্প লেখার টুকিটাকি বিশদভাবে তুলে ধরে সেমিনারীয়ানদের লিখতে অনুপ্রাণিত করেন। দুপুরে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রমনা সেমিনারীর আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার যোসেফ চিসিম। দুপুরের খাবারের পর লেখালেখির অনুশীলন পর্বটা পরিচালনা করেন ফাদার বুলবুল ও ফাদার যোসেফ। সকল অংশগ্রহণকারী ৪ দলে বিভক্ত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট বিষয়ে লিখেন। বিকাল ৪:৩০ মিনিটে লেখালেখির প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রমনা সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মিল্টন রোজারিও। অতঃপর কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার বুলবুল রিবেরুর ধন্যবাদ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য মিডিয়া সেমিনারে ৯৫জন সেমিনারীয়ান ও ৭জন ফাদার উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের মনিপুরে সংগঠিত সহিংস ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের উদ্বেগ, প্রতিবাদ ও নিন্দা প্রকাশ

স্বপন রোজারিও ▯ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মনিপুরে অব্যাহত জাতিগত দাঙ্গায় প্রাণহানি, ঘরবাড়ি, গির্জা, মন্দির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন। এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও এবং মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে এই উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনার প্রতিবাদ, নিন্দা এবং ধিক্কার জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, এই ঘটনা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সাথে কোনভাবেই যায় না। এই যুগে ধর্মীয় ও জাতিগত সংঘাত নিতান্তই বেমানান। অবিলম্বে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক, অমানবিক এবং হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছি আমরা। ভারত সরকারকে নিরপেক্ষ ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে, জাতি-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সহাবস্থান ও আস্থা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি, পরিবার, সংস্থা ও সংগঠনগুলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানেরও অনুরোধ জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য যে, গত দুই মাস ধরে চলা এই দাঙ্গায় এ পর্যন্ত ১২০ জনেরও বেশি ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। ১ হাজার ৭০০ এর বেশি ঘরবাড়ি, ২৫০টি গির্জা, বেশ কিছু মন্দির আক্রান্ত হয়েছে। ৫০ হাজারের বেশি মানুষ গৃহহীন হয়েছেন॥

লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সেমিনার

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ▯ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির সহযোগিতায় এবং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের উদ্যোগে "মিলন ও একতার উৎস যিশু, ভালোবাসেন সকল শিশু"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ১৪ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল সেমিনার করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার ডনেল স্টিফেন সিএসসি এবং সহকারি পাল-পুরোহিত ফাদার নিত্য এক্কা সিএসসি। উপদেশে ফাদার ডনেল, "শিশুদের আলোতে পথ চলতে এবং যিশুকে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করেন। খ্রস্টযাগের পর শিশুরা ও এনিমেটরগণ র‍্যালি করে সেমিনার কক্ষে প্রবেশ করেন। টিফিন বিরতির পর ধর্মপল্লীর শিশুরা বরণ নৃত্যের মাধ্যমে সবাইকে বরণ করে নিলে লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর শিশুমঙ্গল আহ্বায়িকা সিস্টার মাগ্রেট গমেজ আরএনডিএম সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। ফাদার প্রলয় ডি' ক্রুশ মূলসুরের উপর মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সহভাগিতা করেন। সিস্টার মারীয়া দাস সিআইসি এবং সিস্টার ঝুমা নাফাক এসএসএমআই বাংলাদেশের কার্যক্রম সম্বন্ধে সহভাগিতা করেন। পরে

এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোতা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার দেয়া হয়। ফাদার ডনেল স্টিফেন সিএসসি, সিস্টার মারীয়া দাস এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল সংঘের সেক্রেটারী সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে।

সেমিনারে ৬৭ জন শিশু, ১৪ জন এনিমেটর, ৫জন সিস্টার এবং ৪জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

“একতা উন্নয়ন প্রকল্প” এর শুভ উদ্বোধন

দিপালী এম গমেজ ❑ গত ১৪ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে, নবাবগঞ্জ জেলার বান্দুরাতে, ঢাকা ক্রেডিট কনভেনশন সেন্টারে আঠারো গ্রামের নারী উদ্যোক্তাদের “একতা উন্নয়ন প্রকল্প” এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন নবাবগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান, সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল রিবেরু, নটরডেম কলেজের অধ্যাপক ফাদার হিউবার্ট লিটন গমেজ সিএসসি, হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার স্টেনিসলাউস গমেজ, ফাদার রিপন, ফাদার আবেল রোজারিও, বান্দুরাসহ পাশ্ববর্তী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, সিস্টার রুপালী কস্তা সহ আরও অনেকে। প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি তার বক্তব্যে বলেন, নব উদ্যোক্তাদের সমাগম দেখে আমি অনেক আনন্দিত এবং এ উদ্যোগ যারা গ্রহণ করেছেন তাদের সাধুবাদ জানাই। দিপালী গমেজ তার সহভাগিতায় মহিলাদের নিয়ে কাজ করার এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করেন। ঘরে বসেও যেন মহিলাগণ আয় করে সঞ্চয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে এটাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

উক্ত অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩২০ জন। উদ্যোক্তাদের পণ্য নিয়ে স্টলের ব্যবস্থাও ছিল এই আয়োজনে। উদ্যোক্তা প্রকল্পের আয়োজক দিপালী গমেজের একান্ত প্রচেষ্টায় এবং রিংকু গমেজের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছে॥

মহাখালী লূর্দের রাণী গীর্জায় বিশ্ব মা-দিবস এবং বাবা-দিবস উদ্‌যাপন

পিটার রোজারিও ❑ গত ১৪ মে এবং ১৮ জুন মহাখালী লূর্দের রাণী গীর্জায় সকল খ্রিস্ট-ভক্তদের আংশগ্রহণে বিশ্ব মা-দিবস এবং বাবা-দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। মা-দিবসে মায়েদের অংশগ্রহণে সকল অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়, ফাদার সনি রোজারিও মা-দিবসে সকলের উদ্দেশে মায়েদের নিয়ে তার অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। অনুষ্ঠানে মায়েদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ সাংস্কৃতিক পর্ব এবং বিশেষ গেইম শো, সকল মায়েরা প্রতিটি পর্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন উপহারগ্রহণ করেন, সেইসাথে স্মরণ করা হয় সেই-সকল মায়েদের যারা আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন। সর্বশেষে বিভিন্ন সেবা কাজে বিশেষ অবদানের জন্য ৪জন মাকে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মাননা।

তেমনি ১৮ জুন বাবা দিবস পালন করা হয়, ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই বক্তব্য রাখেন এবং বাবাদের নিয়ে তার মনের অনুভূতি তুলে ধরেন। বাবা দিবসে বাবারা চমৎকার সব আয়োজন করেন সন্তানদের জন্য, বাবাদের পরিবশেনায় ছিলো যাদু, কনসার্ট ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যদিয়ে শেষ উক্তদিনের অনুষ্ঠান॥

ইক্রাশীতে শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব পালন

রিপন আন্তনী ডি’ রোজারিও ❑ প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশ ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালিত হলো হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর অধীনে ইক্রাশী চ্যাপেলের প্রতিপালক শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব দিবস। নয়দিন ব্যাপী আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর এই পর্ব পালন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে ইক্রাশী গ্রাম ছাড়াও হাসনাবাদের অন্যান্য গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ যোগদান করেন । সকাল ৯:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগ আরম্ভ হয়। আর এই পবিত্র পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন (অবসরপ্রাপ্ত) বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি এবং আরো অংশগ্রহণ করেন ১১ জন যাজক, কয়েকজন সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তগণ। সহভাগিতায় বিশপ বলেন, সাধু যোসেফের উপস্থিতি বাইবেলে খুবই অল্প, তথাপি এই নিরব পথ চলার মধ্যদিয়ে তিনি পরিত্রাণের ইতিহাসকে চলমান রেখেছিলেন মা-মারীয়ার পাশে থেকে। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে সবার জন্য বিস্কুট ও সাধু যোসেফের কার্ড আশীর্বাদ করে তা প্রদান করা হয়। পরিশেষে পাল-পুরোহিত ফাদার স্ট্যান্সিলাউস গমেজ, পর্বীয় খ্রিস্টযাগে যারা অংশগ্রহণ করেছেন ও যারা এই পর্ব উদ্‌যাপন করতে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন॥

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ৪০০ টাকা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। আপনাদের আমরা একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা না হলেই নয়। আপনারা জানেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর পথচলা বর্তমানে ৮৩ বছরের। এতো প্রাচীন পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশে গ্রাহক হিসেবে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সব সময়ই সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদের হাতের কাছে পৌঁছে থাকে। পত্রিকা প্রকাশে আপনাদের অবদানের পাশাপাশি এর খরচের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। দিনদিন এর খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী তার নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত, কোন অনুদানের উপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় না।

একজন গ্রাহকের পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক কপির জন্যে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয়। বছরে প্রায় ৪৪টি সাধারণ সংখ্যা, একটি ইস্টার সংখ্যা ও একটি বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের পিছনে খরচ হয় ৮৮০ টাকা (এখানে কর্মীর বেতন ও অফিস এডমিনিস্ট্রেশন খরচ ধরা হয়নি)। আপনারা বর্তমানে দিচ্ছেন ৩০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কপির জন্যে প্রায় ৬টাকা, এর মধ্যে পাচ্ছেন ১০০ টাকার বড়দিন ও ৩০ টাকার ইস্টার সংখ্যা, বাকী ১৩ টাকা প্রতি সপ্তাহে প্রতি কপির জন্যে ভর্তুকি বহন করতে হয় প্রতিবেশীকেই, যা বছর শেষে একজন গ্রাহকের পিছনে ভর্তুতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৭২ টাকা। তবে বিজ্ঞাপন বাবদ যে আয় হয় তা সামান্যই ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক গ্রাহক রয়েছেন যারা নিয়মিত গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন না।

তাই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে গতিশীল ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি হতে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই প্রতিবেশীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লালন-পালন করা, আমার আপনার সকলের দায়িত্ব।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

☛ আপনি কি আপনার ব্যক্তিগত কিংবা প্রতিষ্ঠানের কোন ডকুমেন্টারী নির্মাণ করতে চান?
☛ আপনি কি কোন পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করতে চান?
☛ আপনি কি কোন গানের এ্যালবাম বের করতে চান?

তাহলে দেরী কেন, আজই আসুন ঐতিহ্যবাহী ডিজিটাল স্টুডিও বাণীদীপ্তিতে –

❖ সুবৃহৎ স্টুডিও (গান, নাটক, বিজ্ঞাপনের স্যুটিং করার জন্য)
❖ রয়েছে সর্বাধুনিক ক্যামেরা
❖ আছে দক্ষ ক্যামেরাম্যান
❖ আছে অভিজ্ঞ শব্দগ্রাহক প্যানেল
❖ রয়েছে সমৃদ্ধ এডিটিং প্যানেল ও এডিটর।

বাণীদীপ্তির ধর্মীয় গানের সিডি ও ভিডিওগুলো আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের একান্ত সহায়ক।

ঘরে বসে গানগুলো দেখতে ও শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন
আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বাণীদীপ্তি মিডিয়া
www.youtube.com/BanideeptiMedia

আজই যোগাযোগ করুন -
বাণীদীপ্তি, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ , লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন: ০১৭৭৬৫৮২০১৫
E-Mail: banideepticcc7@gmail.com

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ২৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 25
Regd. No. DA-33
❖ 23 - 29 July, 2023, ৮ - ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ফাদার
বকুল এস রোজারিও সিএসসি

জন্ম : ১৮ জুলাই, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৪ জুলাই, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ

তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহাপরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম -

২৪ জুলাই, এই দিনে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আজও আমাদের এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নিতে কষ্ট হয় যে, তুমি আমাদের মাঝে নেই; তবুও তুমি বেঁচে আছো আমাদের হৃদয় মাঝে, আছো তোমার অসংখ্য ছাত্র এবং প্রিয়জনদের হৃদয়ে। আমরাও বেঁচে আছি তোমার আদর, স্নেহ ও ভালবাসাকে সম্বল করে।

তুমি স্বর্গধাম হতে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন, আমরা তোমার ভাল কাজ, ভালবাসা, উদারতা, ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাশীলতা অনুসরণ করতে পারি এবং ভালবাসা, একতায়, মিলন ও শান্তিতে একত্রে বাস করতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তোমারই শোকার্ত পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/২২৪/২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org